Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুন্নত - জীবনের সৌরভ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ ইফতেখার রাসুল আকাশ

রোলঃ 23090110032

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সুন্নত - জীবনের সৌরভ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোঃ ইফতেখার রাসুল আকাশ

রোলঃ 23090110032

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সুন্নত - জীবনের সৌরভ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোঃ ইফতেখার রাসুল আকাশ, আইডিঃ 23090110032 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা রাহাত আহমাদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ সুন্নত - জীবনের সৌরভ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা রাহাত আহমাদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মোঃ ইফতেখার রাসুল আকাশ

আইডিঃ 23090110032

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইসলামে সুন্নাহর গুরুত্ব- 6

রাসূলুল্লাহ সা এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি 17

সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সুন্নাহ আকড়ে ধরেছিলেন। 30

জীবন্ত সুন্নাহ 48

আখলাকে সুন্নাহঃ 55

পারিবারিক জীবনে সুন্নাহ 58

ব্যবসা বাণিজ্যে সুন্নাহ 74

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহঃ 84

পোশাক পরিচ্ছদের সুন্নাহ 88

শারীরিক সুস্থতায় সুন্নাহ 96

সুন্নাহর সুফল ও উপকারিতা 98

সুন্নতই মুক্তির পথ ও বর্জনে পরিণতি 109

সুন্নতে জান্নাত ক্রয় 116

সুন্নাহ ও বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়-ভাবনা 122

উপসংহার 124

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছে সাহায্য চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং আমাদের কার্যকলাপের নিকৃষ্টতা হতে আশ্রয় চাই। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে পরিচালিত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল।
অতঃপর।"

সুন্নাহ বা হাদীস: সুন্নাহ(سُنَّة) শব্দটির আভিধানিক অর্থ- পন্থা, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নিয়ম। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে সুন্নাহ হচ্ছে মহানবী(সা)-এর কথা, কাজ কিংবা তাঁর সমর্থিত কথা বা কাজের বিবরণ।

মহানবী(সা)-এর আনুগত্য ও তাঁর কর্মনীতির অনুসরণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা বর্জন করো। তাই সাহাবায়ে কেরাম বিনা বাক্যে অক্ষরে অক্ষরে মহানবী(সা) -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। প্রিয়নবী-এর কাছে যা শুনতেন বা যা তাঁকে করতে দেখতেন; সাহাবায়ে কেরাম বিনা বাক্যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে তা পালন করতেন। যেমন- রাসূল(সা) -কে অযু করতে দেখলে সাহাবায়ে কেরামও তাঁর অনুসরণে এইভাবে ওযু করতেন। তাতে কোনটা ফরজ, কোনটা ওয়াজিব, কোনটা মুস্তাহাব, সাহাবায়ে কেরাম তা জানার প্রয়োজনবোধ করেননি। সুতরাং ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি প্রকারভেদ রাসূল(সা) -এর সময়ে ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল(সা) -এর নিকট এসব বিষয়ে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তবে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে অবশ্য তাঁরা জিজ্ঞাসা করতেন। রাসূল(সা) তার সুষ্ঠু সমাধান দিতেন।(আল ফিকহুল মুয়াসসার)

ইসলামে সুন্নাহর গুরুত্ব-

শরীয়তের প্রথম ভিত্তি হলো কুরআন। ‘সুন্নাহ’ হল ২য় ভিত্তি। সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়কে সুস্পষ্ট করা হয়। কঠিন বিষয়াবলির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। ব্যাপক বিষয়গুলোকে নির্দিষ্ট করা হয়। সংক্ষিপ্ত বিষয়াবলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের কথা দ্বারা, কখনো নিজের কর্ম দ্বারা, কখনো উভয়টি দ্বারা কুরআনের ব্যাখ্যা করেন। কয়েকটি উদাহরণ পেশ করলে বিষয়টি সহজে বুঝতে পারা যায়। পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

যারা ঈমান আনবে এবং তাদের ঈমানের সাথে অন্ধকার মিশ্রিত করবে না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত।- সূরা আনআম: ৮২।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো, সাহাবাদের অন্তরে চিন্তার ঝড় উঠলো! পরস্পর বলাবলি করতে থাকলেন যে, আমাদের কে নিজেদের ঈমানের সাথে অন্ধকার মিশ্রিত করেনি? সাহাবারা এসে মনের খটকা জানালেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তিনি বললেন, এখানে অন্ধকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক। তোমরা দেখোনি পবিত্র কুরআনে লুকমান হাকিম তাঁর ছেলেকে নসিহতে বলেছিলেন, ‘তুমি শিরক থেকে বেঁচে থাকো। কারণ শিরক হলো অনেক বড় অন্ধকার।’

বাহ্যিকভাবে এ আয়াত পড়েই অন্ধকার দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সেটা কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই সেটার ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।

সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনের ব্যাখ্যা করা হয়, এর কিছু উপমা নিম্নে তুলে ধরছি।

* আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় বলেছেন:
‘তোমরা নামায আদায় কর এবং জাকাত প্রদান কর।’

কিন্তু কখন নামাজ পড়বে? কত ওয়াক্ত নামাজ পড়বে? কখন নামাজ কোন নামাজের ওয়াক্ত শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে? কোন ওয়াক্ত নামাজ কত রাকাত পড়বে? নামাজ পড়ার পদ্ধতি কি? কি কি জিনিস নামাজে ফরজ? সে সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

সেগুলো সম্পর্কে উম্মতকে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর কর্ম তথা সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষ এগুলো সম্পর্কে জানতে পেরেছে।
এমনিভাবে জাকাত কখন ওয়াজিব হবে, তার নেসাব, পরিমান, কোন জিনিসের উপর জাকাত ওয়াজিব হবে? সে সম্পর্কে কুরআনে কোন কিছু বলা হয়নি। কুরআনে শুধুমাত্র জাকাতপ্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়াসাল্লাম সব বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

সুন্নাহর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য মনে হয় একটি উদাহরণই যথেষ্ট। আপনি যদি সুন্নাহকে বাদ দিয়ে শুধু কুরআনের উপর আমল করতে চান, নিজেকে 'আহলে কুরআন' দাবি করেন, তাহলে ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত নামাজ পড়তে পারবেন না। কারণ কুরআনে শুধুমাত্র নামাজ পড়ার নির্দেশ দিয়েছে। বাকি সবকিছু রয়েছে সুন্নাহতে। এজন্য মুসলামনদের কাছে কুরআনের পরেই হলো সুন্নাহর অবস্থান।

* আরেক আয়াতে তায়ালার দীপ্ত ঘোষনা,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

'চুর পুরুষ এবং মহিলার হস্ত কর্তন কর কৃতকর্মের ফল হিসাবে। সুরা মায়েদা, আয়াত নং ৩৮

কিন্তু কথা হলো একজন সামান্য ঘাস চুরি করলো? অথবা কারো পকেট থেকে চকলেট খাওয়ার জন্য একটাকা নিয়ে গেলো? তার হাত কেটে ফেলা হবে? কত টাকা চুরি করলে হাত কাটা হবে? হাত কোন জায়গায় কাটবে? বারবার চুরি করলে কীভাবে তার হাত কাটা হবে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি কুরআনে পাবেন না। অবশ্যই আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর আশ্রয় নিতে হবে। সেখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা পেয়ে যাবেন।

* আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

'ব্যাভিচারি পুরুষ এবং ব্যাভিচারিণী মহিলাকে একশটি বেত্রাঘাত করো।' -সূরা নুর: ২।

মানুষ বিয়ে করার আগে ব্যভিচার করতে পারে। আবার বিয়ে করার পরও করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এ শাস্তি কি সকলের জন্য? সুন্নাহ এসে পার্থক্য করেছে। বিবাহের আগে

ব্যভিচার করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে। কিন্তু বিবাহের পর কেউ ব্যাভিচার করলে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে।

অনুধাবনের জন্য মাত্র কয়েকটি উপমা পেশ করা হল। এ ধরণের উপমার শেষ নেই। মোটাদাগে বলতে গেলে বলতে হয় যে, সুন্নাহ না থাকলে আমাদের জন্য কুরআন অনুধাবন করা সম্ভব ছিলো না। কারণ ইসলামের অনেক বিষয়াবলি সম্পর্কে কুরআনে শুধুমাত্র নির্দেশপ্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সুন্নাহতে। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবা এবং তাবেয়িনরা কুরআনের মতোই সুন্নাহর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। কেউ সুন্নাহকে বাদ দিয়ে কুরআন নিয়ে পড়ে থাকতে চাইলে তাদের শক্তভাবে খণ্ডন করেছেন। এ সম্পর্কে কয়েকজনের বক্তব্য তুলে ধরা হল।

আবদুল্লাহ বিন মুবারক রহ. ইমরান বিন হুসাইন রা. এর সূত্রে বর্ণনা করেন, তাঁর কাছে একজন লোক এসে জানতে চাইলো।
তিনি হাদীস থেকে উত্তরপ্রদান করলেন।
ওই ব্যক্তি বললো, আপনি কুরআন বাদ দিয়ে সারাদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস নিয়ে পড়ে থাকেন কেন?

প্রশ্ন শুনে ইমরান বিন হুসাইন রা. বললেন,
إِنَّكَ امْرُؤٌ أَحْمَقُ ,أَتَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنَّ صَلاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا لا يُجْهَرُ فِيهَا ,وَعَدَّ الصَّلَوَاتِ وَعَدَّدَ الزَّكَاةِ وَنَحْوَهَا ,ثُمَّ قَالَ :أَتَجِدُ هَذَا مُفَسَّرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ,إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْكَمَ ذَلِكَ وَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ ذَلِكَ
তুমি একজন আহম্মক। তুমি কি কুরআনে পাবে জোহরের নামাজ চার রাকাত? তাতে কেরাত উচ্চস্বরে পড়া হবে না?
এতপর অন্যান্য নামাজ এবং জাকাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, উপরোক্ত বিষয়গুলো তুমি কি কুরআনে বিস্তারিতভাবে পাবে? কুরআনে বিষয়গুলোকে অস্প’ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘সুন্নাহ’ তে বিষয়গুলো পরিষ্কার করা হয়েছে।- মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক, হাদিস নং ২৩৩

ইমরান বিন হুসাইন রা. ওই ব্যক্তিকে বুঝানোর জন্য বাস্তবতা দ্বারা উপমা পেশ করেছেন। যে বাস্তবতা কোনো বিবেকবান অস্বীকার করতে পারবে না। এছাড়া ইমরান বিন হুসাইন রা. প্রশ্ন শুনে তাকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছেন। এতে সে পরিপূর্ণ আগ্রহের সাথে পরবর্তী কথা বুঝার

চেষ্টা করবে। তিনি তাকে বুঝাতে চেয়েছেন যে, জীবনে চলতে হলে কুরআনের সাথে সাথে সুন্নাহরও প্রয়োজন।

* ইমাম মাকহুল রহঃ থেকে বর্ণিত:

"القرآن أحوج إلى السنة من السنة الى القرآن"

অর্থাৎ সুন্নাহ কুরআনের চেয়ে কুরআন সুন্নাহর বেশি মুখাপেক্ষী।- আল কিফায়া, পৃষ্ঠা নং৩০.দারুল কিতাবিল আরাবি

মাকহুল রহ. তাবেয়িনদের মাঝে প্রসিদ্ধ মুফাসসিরদের একজন। তার একথা থেকে অনেকে সুযোগ নিতে চাইবে! বলবে যে, তিনি কুরআন থেকেও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সুন্নাহকে!

অথচ বাস্তবতা কিন্তু এমন না! ইসলামের সবার শীর্ষে হলো কুরআনের স্থান। এখানে মূলত তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, সুন্নাহর কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের জন্য আমাদের কুরআনের কাছে যেতে হয় না! রাসূল সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই কথা, কর্ম বা মৌন সমর্থন দ্বারা আমাদের কাছে বিশ্লেষণ পেশ করে গেছেন। কিন্তু কুরআনের বহু আয়াত এমন রয়েছে, যেগুলোর সঠিক মর্ম উদ্ধার করতে হলে আমাদের সুন্নাহর কাছে যেতে হবে। পূর্বে এ সংক্রান্ত তিনটি উপমা পেশ করা হয়েছে। এ দিক বিবেচনা করে তিনি উক্ত কথা বলেছেন। মূলত এরদ্বারা তিনি সুন্নাহর গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

* আইয়ুব সাখতিয়ানি রহ. বলেন,

"أذا حدثت الرجل باالسنة فقال :دعنا من هذا و حدثنا من القران فاعلم أنه ضال مضل"

অর্থাৎ যখন তুমি কারো কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করবে, সে তখন বলবে, এগুলো বাদ দিয়ে কুরআন থেকে বর্ণনা করো, তাহলে তুমি জেনে রাখ, নিশ্চই সে পথভ্রষ্ট। আল কিফায়া, পৃষ্ঠা নং ৩১, দারুল কিতাবিল আরাবি

পথভ্রষ্ট হওয়ার স্পষ্ট। এমনকি কিছু কিছু অস্বীকারের কারণে সে ঈমান হারিয়ে ফেলবে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণের নির্দেশপ্রদান করেছেন! এখন কেউ হাদীসকে এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর নির্দেশকে এড়িয়ে যাওয়া। যা অবশ্যই ভ্রষ্টতা। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে ঈমান হন্তারক হয়ে যাবে।

* ইমাম আব্দুর রহমান বিন মাহদি রহ. বলেন,

”الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الآكل والشرب.و قال:الحديث تفسير القرآن

অর্থাৎ মানুষ খাওয়া-দাওয়া এবং পানাহারের চেয়ে হাদীসের অধিক মুখাপেক্ষী। আল কিফায়া, পৃষ্ঠা নং ৩১

আবদুর রহমান বিন মাহদি রহ. এর কথাটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। বিশেষত বর্তমানে যারা ‘আহলে কুরআন’ এর নামে হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করতে চান। মানুষ একটানা কয়েকদিন না খেয়ে থাকতে পারে! কষ্ট করে জীবনধারণ করতে পারে! কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে বাদ দিয়ে সে এক ঘন্টাও চলতে পারবে না। কারণ ঘুমাতে গেলেও তাঁর সুন্নাত রয়েছে। হাটতে গেলে সেটার আলাদা সুন্নাত রয়েছে। খেতে গেলে সেটারও আলাদা সুন্নাত রয়েছে। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন! যাতে উম্মাত সে নির্দেশনা মেনে সহজেই জীবন পরিচালনা করতে পারে।

গবেষণা কী?

গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। যার সাধারণ অর্থ হলো, সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। এর সমার্থবোধক শব্দ হলো জিজ্ঞাসা, তদন্ত, অনুসন্ধান, বিকিরণ এবং নিরুপণ।

গবেষণা হলো জিজ্ঞাসার উত্তর, অন্বেষণের লক্ষ্যে তদন্ত করা এবং তদন্তের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা। সংগৃহীত তথ্যের চিত্র অনুসন্ধান করে জিজ্ঞাসার উত্তর বের করা।

আরবীতে একে ‘বাহাস’ বলা হয়। যার অর্থ হলো মাটির ভিতর কোন কিছু তালাশ করা, খুঁজে বের করা, ইত্যাদি।

গবেষনাকে ইংরেজিতে বলা হয় RESEARCH

ধর্মীয় গবেষণায় জীবনের যে কোন দিক সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান স্পষ্টরূপে বর্ণনা করার প্রয়াস চালানো হয়। নিখুঁত পদ্ধতি, সঠিক উপলব্ধি, নির্ভুল বুঝের ভিত্তিতে গভীর অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে দীনের আলোকে কোন সমস্যার সমাধান করার প্রচেষ্টা হলো ধর্মীয় গবেষণা। -(লামহাত ফিল মাকতাবাহ)[https://icabdlibrary.com]

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ মানবজাতিকে চিন্তা ও গবেষণায় উৎসাহিত করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা কি নিজেদের অন্তরে ভেবে দেখে না? আল্লাহ আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট কালের জন্য’ (সুরা: রোম, আয়াত:৮) অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, ‘তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুত চোখ তো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে তাদের বক্ষস্থ হৃদয়।’ (সুরা: হজ, আয়াত: ৪৬)

অতীত ও বর্তমান যুগের প্রায় সব আলেম একমত যে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি, তাঁর সৃষ্টিজগৎ, পার্থিব জীবনের অসারতা, পরকালীন জীবনের পুরস্কার ও শাস্তি ইত্যাদি বিষয়ে চিন্তা, গবেষণা ও ধ্যান করা মুস্তাহাব। যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলেন, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ অসংখ্যবার চিন্তা-ভাবনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইসলামী আইনের মূলনীতি অনুসারে আল্লাহর নির্দেশবাচক বাক্যের সর্বনিম্ন বিধান হলো তা মুস্তাহাব বিবেচিত হবে। এ ছাড়া আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাকারীর প্রশংসা করে বলেছেন, '(তারাই সফল) যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। আপনি পবিত্র, আপনি আমাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।' (সুরা: আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১) মানুষের চিন্তা ও ভাবনা, যা কোনো কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই মনের ভেতর উপস্থিত তা এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং গভীর চিন্তা ও গবেষণা—যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে অর্জিত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে?' (সুরা: গাশিয়া, আয়াত: ১৭-২০। মুফাসসিররা বলেন, মানুষ গবাদি পশু, আকাশ, পাহাড় ও ভূমির প্রতি দৃষ্টিদানে অভ্যস্ত হওয়ার পরও আল্লাহ এসব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করতে বলার উদ্দেশ্য হলো তারা যেন এসব বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করে।

পৃথিবীতে মানুষ যেসব বিষয়ে চিন্তা, গবেষণা ও ধ্যান করে তার মধ্যে সর্বোত্তম চিন্তা হলো আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করা। কেননা এর মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি কি দেখো না আল্লাহ রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন? তিনি চন্দ্র-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি বিচরণ করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত; তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।' (সুরা: লুকমান, আয়াত: ২৯)

চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে মুমিনরাই বেশি উপকৃত হয়। কেননা তারা সৃষ্টিজগতের স্রষ্টার পরিচয় এবং সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে বেশি অবগত। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন আছে পৃথিবীতে এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?' (সুরা: জারিয়াত, আয়াত: ২০-২১)

চিন্তা-গবেষণার যত উপকার: মুসলিম মনীষীরা আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি এবং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণার বেশ কয়েকটি উপকারের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো—১. ঈমান দৃঢ়তা লাভ করে, ২. আমলের আগ্রহ জন্ম নেয়, ৩. সংশয় দূর হয়, ৪. পাপ ত্যাগ করা সহজ

হয়, ৫. অন্তর নরম হয়, ৬. অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, ৭. আল্লাহর পরিচয় ও ভালোবাসা লাভ করা যায় ইত্যাদি। (ইসলামওয়ে ডটনেট)

চিন্তা না করার ভয়াবহ পরিণতি: যারা তাদের ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা সত্য উপলব্ধির চেষ্টা করে না তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে, 'আমি তো বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা শ্রবণ করে না; তারা পশুর মতো, বরং তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত। তারাই উদাসীন। '

(সুরা: আরাফ, আয়াত:১৭৯) [https://anniyat.com/]

তাই এই বিষয়ে অর্থাৎ সুন্নাহ এর উপর আমাদের গভীর জ্ঞান এর জন্য সমস্যা সমাধান ও আমাদের জীবনে তা প্রতিফলিত করার জন্য ও উম্মতকে এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ, উম্মাহর জীবনে কিভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায় তার জন্য উম্মাহর আরো গবেষণা বেশি বেশি করা দরকার।

রাসূল (সা) এর জীবন দর্শন সংক্ষেপণ

বংশ পরিচয়ঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বংশ সারা বিশ্বের সেরা ও উত্তম বংশ। আপন পর সবাই অকপটে তা স্বীকার করত। আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বোচ্চ বংশোদ্ভত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ "আল্লাহ তাঁর রিসালত বা পয়গামের দায়িত্ব কাকে দিচ্ছেন সে ব্যাপারে অনেক জ্ঞাত।" (সূরা আন আমঃ ১২৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেনঃ "আমি বনী আদমের সর্বোত্তম বংশে প্রেরীত হয়েছি। আমার যুগই সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ।"(সহীহ আল বুখারীঃ ৪/১৫১)

আব্দুল্লাহ ও আমেনাঃ

কুরাইশ সর্দার আব্দুল মুত্তালিবের ছিল দশ পুত্র। এদের সকলেই ছিলেন বিশিষ্ট ও খ্যাতিমান। তাঁর সকল পুত্রের মধ্যে আব্দুল্লাহ খুবই প্রশংসনীয় গুণাবলী ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা বিয়ে দিয়েছিলেন বনূ যুহরার সর্দার ওহাব এর কন্যা আমেনার সঙ্গে, যাকে সে সময় উচ্চ বংশ, সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে কুরায়শদের ভিতর সবচেয়ে সম্মানিত মহিলা মনে করা হত।

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃগর্ভে থাকাকালেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি সিরিয়া সফর থেকে ফেরার পথে মদীনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তথায় মৃত্যু বরণ করেন। 'দার আল্ নাবেগা আলজা'দী' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। (আর রাহীকুল মাখতুম, ছফীউররাহমান মুবারকপুরী, পৃঃ ৫৩।) হযরত

আমেনা তাঁর জন্মের পূর্বেই এমন বহু নিদর্শন দেখতে পান যাদ্বারা বোঝা যেত যে, তাঁর সন্তানের ভবিষ্যৎ অত্যুজ্জ্বল ও মর্যাদাকর হবে।" (নবীয়ে রহমত- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী- ১১৩)

জন্মঃ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'আমুল ফীল' অর্থাৎ হস্তি বাহিনীর অভিযানের বছর প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে রবিউল আওয়াল মাসের ১৭ তারিখ মুতাবিক ৫৭০ খৃষ্টাব্দ শুক্রুবার দিন সকালে জন্ম গ্রহণ করেন। এটি ছিল মানবতার ইতিহাসের সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল ও বরকতময় দিন।

উল্লেখ্য যে, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম তারিখের ব্যাপারে বিদ্বান গণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে অনেক উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেনঃ "ইমাম মালিক ও অন্যান্য মুহাদ্দিসরা মুহাম্মদ ইবনে জুবাইর ইবনে মুত্‌ইম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম তারিখ হল, রবিউল আওয়ালের ৮ তারিখ। হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে মূছা আল খাওয়ারযমী এউক্তিকে অকাট্য বলেছেন। আর ইবনে দেহয়াহ এউক্তিকে প্রধান্য দিয়েছেন।"(সহীহুস সীরাতিন নববীয়্যাহ, টীকা, পৃঃ ১৩।)

নাম করণঃ

হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হতেই মা আমেনা এসংবাদ দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে পাঠান। সংবাদ পেতেই তিনি ছুটে আসেন, পরম স্নেহে দেখেন, যত্নের সঙ্গে কোলে নিয়ে কা'বার ভেতর প্রবেশ করেন, আল্লাহর হামদ বর্ণনা করেন এবং দোয়া করেন। অতঃপর তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মদ'। আরবে এনাম ছিল একেবারেই নতুন। ফলে লোকেরা খুব বিস্মিত হয়। (সীরাতে ইবনে হিশামঃ ১/১৫৯-৬০, ইবনু কাছীরঃ ১/২১০।)

যুবাইর ইবনে মুতায়িম থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি মুহাম্মদ, আহমদ, হাশির, আকিব, মাহি এবং খাতম।" (মুসনাদে আহমদঃ ৪/৮১,৮৪/ ১৬৮৬৯,১৬৮৯২।)

মদীনার সফরঃ

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন ছয় বছর চলছিল তখন মা আমেনা তাঁকে নিয়ে মদীনা সফর করলেন। সাথে ছিল উম্মে আয়মান বারাকা নামে একজন হাবশী দাসী। 'ইয়াছরিব' তথা মদীনা শরীফের নাজ্জার গোত্র ছিল তাঁর দাদার মাতৃকুল। আর রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ এর কবরও ছিল

তথায়। মা আমেনা তাঁর শিশুকে নিয়ে প্রায় এক মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। (সীরাতুন্নাবী-আল্লামা শিবলী)

দাদার স্নেহ ছায়ায়ঃ

তখন থেকে পিতা মাতা হারা এই শিশু দাদার স্নেহ ছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকে। দাদা তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে চাইতেন, ভালবাসতেন এবং ক্ষণিকের তরেও তিনি তাঁর এই এতীম পৌত্র সম্পর্কে গাফেল হতেন না।

দাদার ইন্তেকালঃ

দুই বৎসর পর্যন্ত হযরত দাদা আব্দুল মুত্তালিব স্বীয় পৌত্র মুহাম্মাদ (সা) কে অতি আদর যত্নের সহিত লালন পালন করেন। যখন তাঁর বয়স আট বছরে উপণিত হয় তখন তাঁর দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব বিরাশী বছর বয়সে ইহদাম ত্যাগ করেন।

চাচা আবু তালিবের দায়িত্বেঃ

তাঁর দাদা ইন্তেকালের সময় নিজ পুত্র আবু তালিব কে পৌত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অছিয়ত করে যান এবং তাঁকে লালন-পালন করার দায়িত্ব দিয়ে যান। হযরত আবু তালিবও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদের চেয়েও বেশী মায়া দিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন।

খদীজা (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহঃ

যখন তিনি পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত হলেন তখন হযরত খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ এর সঙ্গেঁ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত খদীজা কুরায়শ গোত্রের খুবই প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন এবং বোধ শক্তি, দুরদর্শিতা, মহান চরিত্র ও ব্যবহার, অধিকন্তু ধন সম্পদের দিক দিয়েও খ্যাতনাম্নী ছিলেন।

বিয়ের সময় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর হযরত খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর। আবু তালেব বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং এখান থেকেই তাঁর দাম্পত্য জীবনের সূচনা ঘটে। তাঁর সন্তান ইব্রাহীম ছাড়া আর সকলেই ছিলেন হযরত খাদীজার গর্ভজাত। (সীরাত ইবনে হিশামঃ ১/১৮৭-৯০, ইবন কাছীরঃ ২৬২-৬৫, নবীয়ে রহমত পৃ ১২০, ১২১।)

কা’বার নব নির্মাণ এবং একটি বিরাট ফেতনার অবসানঃ

রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরায়শরা নতুন ভাবে কা’বা শরীফ নির্মাণ করতে চাইলেন এবং এর উপর ছাদ ঢালাইয়ের মনস্থ করলেন। দেওয়াল যখন উঁচু করে হাজরে আসওয়াদের উচ্চতা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে কুরায়শ নেতৃবর্গের মধ্যে বিরাট মতানৈক্য দেখা দিল। প্রতিটি গোত্রই চাচ্ছিল যে, তার গোত্রই এই সৌভাগ্য লাভ করুক এবং তারা এই পাথর উঠিয়ে তার

সঠিক স্থানে স্থাপন করুক। মতানৈক্য বৃদ্ধি পেতে পেতে অবশেষে তা যুদ্ধ বিগ্রহে উপণীত হবার উপক্রম হল। মোট কথা যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল। কুরাইশরা কয়েকদিন যাবত এই সংকটের মাঝে কালক্ষেপণ করল। অতঃপর সকলেই এ বিষয়ে একমত হল যে, যে ব্যক্তি অমুক দিন প্রথম প্রবেশ করবে সে এ ব্যাপারে ফায়সালা প্রদান করবে। অনন্তর সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করেন। তাঁকে প্রবেশ করতে দেখেই সবাই সমস্বরে চেচিয়ে উঠে, এই যে আমাদের 'আল আমীন' আসছেন। আমরা তাঁর ফয়সালায় রাজী আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক গোত্র থেকে এক একজন সর্দার নির্বাচন করলেন এবং একটি চাদর বিছিয়ে নিজ হাতে পাথরটি চাদরের উপর রাখলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের সর্দারকে চাদরের পাশ ধরতে বললেন। তারপর যখন সবাই উঠালেন তখন তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদকে তার বর্তমান স্থানে রেখে দিলেন। (মুসতাদরাকে হাকেম, সীরাতুন্নাবী-আল্লামা শিবলী, ১ম খন্ড, পৃঃ ১২৪)

নুবুওয়াত লাভঃ

চল্লিশের কাছাকাছি সময়ে একাকিত্ব ও নির্জনতা প্রিয়তা তাঁর নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তিনি সকলের থেকে আলাদা হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থানে বিরাট তৃপ্তি ও শান্তি পেতেন। তিনি মক্কার বিভিন্ন ঘাঁটি ও উপত্যকাসমূহ যখন অতিক্রম করতেন তখন গাছ পালা ও প্রস্তর মালা থেকে শব্দ ভেসে আসত 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ '। (আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর রাসূল।) তিনি ডানে বামে ঘুরে তাকাতেন কিন্তু গাছপালা ও প্রস্তর খন্ড ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হত না। তিনি বলেছেনঃ আমি সেই পাথরকে এখনো চিনি যা আমাকে নবী হওয়ার আগে থেকে সালাম করত। (সহীহ মুসলিম।) এসময় তিনি নিজের মধ্যে এক ধরণের অদৃশ্য ও অনিশ্চিত অস্থিরতা অনুভব করতেন। আল্লাহ তাআলা এব্যাপারে বলেছেনঃ "এভাবে আমি তোমার প্রতি ওহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ। তুমি তো জানতেনা কিতাব কি এবং ঈমান কি। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যাদ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়েত করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিকে আহবান করবে"। (সূরা শুরাঃ ৫২।) অন্যত্র বলেনঃ "তুমি আশা করনি যে তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ হবে। এতো কেবল তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। সুতরাং তুমি কখনো কাফিরদের সহায় হয়োনা"। (সূরা কাসাসঃ ৮৬।)

হেরা গুহায় জৌতির সাক্ষাৎ

বেশীর ভাগ সময় তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ পাহাড় 'জাবালে নূরে' অবস্থিত 'গারে হেরা' তথা হেরা গুহায় অবস্থান করতেন এবং উপর্যুপরি কয়েক রাত সেখানে অতিবাহিত করতেন। এর

ব্যবস্থাও তিনি আগে থেকেই করে নিতেন। এভাবে একদা তিনি হেরা গুহায় তশরীফ আনেন এমন সময় তাঁকে নুবুওয়াতের পদমর্যাদা দিয়ে সৌভাগ্যবান করার পবিত্র মুহূর্ত এসে যায়। জন্মের ৪১ তম বছরে ২৭ ই রজব (হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে) মুতাবিক ৬১০ খৃষ্টাব্দ তারিখে জাগ্রত ও চৈতন্য অবস্থায় এঘটনা সংঘটিত হয়। আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল (আঃ) প্রথমবারের মত তাঁর কাছে, পৃথিবীবাসীদের জন্য আল্লাহর সর্বশেষ ঐষীবাণী, বিশ্বমানবতার মুক্তির পথের দিশারী, জ্বিন ও ইনসানের জন্য পরিপূর্ণ জীবন বিধান 'আল্ কুরআনুল কারীম' এর সর্বপ্রথম কথাগুলো নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন।

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে

তাঁর সামনে হেরা গুহায় ফেরেশতা আগমন করেন এবং বলেনঃ পড়ুন। তিনি উত্তর দিলেন আমি কি ভাবে পড়ব? ফেরেশতা বললেনঃ

পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে, তোমার পালনকর্তা মহা দয়ালু।

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতনা"। (সূরা আলাকঃ ১-৫।)

মি'রাজঃ

দ্বাদশ নব্বীতে মি'রাজ সংঘটিত হয়। তথায় মুসলমানদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করা হয়। একই বছর হজ্জের মৌসূমে আঠার জন ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কা আগমন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। হযরত মুছ আ'ব ইবন উমায়রকে তাবলীগের জন্য পাঠান হয় মদীনায়।

হিজরাতঃ

হিজরাতের পর থেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতী জীবনের শেষ পর্ব অর্থাৎ মাদানী জীবন শুরু হয়। নুবুওয়াতের ১৩ বছরে প্রায় ছাহাবীগণ ধীরে ধীরে মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে গেলেন। মহিলা এবং শিশুরা ছাড়া প্রসিদ্ধ ছাহাবীদের মধ্যে আবুবকর এবং আলী (আঃ) ব্যতীত বাকী সবাই মদীনায় হিজরাত করলেন। রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলেহি ওয়া সাল্লাম হিজরাতের জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। পরিশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হিজরাতের জন্য অনুমতি দেয়া হল।

ইন্তেকালঃ

নুবুওয়াত লাভের পর তিনি ২৩ বছর পাঁচ দিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে উম্মতকে দ্বীন শিক্ষা দেন। ২৮ ই সফর ৬৩ বছর বয়সে পবিত্রাত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং তিনি দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে যান। রাসুল (সা) কে হযরত আলী (রা) গোসল দেন এবং তারপর নামাযে জানাযা পড়েন ও দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

রাসূলুল্লাহ সা এর সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি

৫৭০ খ্রি: হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর জন্ম সোমবার, **১২** রবিউল আউয়াল, **২৯** আগস্ট। জন্মের পর আবু লাহাবের দাসী ছুওয়ায়বিয়া (রা)-এর দুধ পান এবং ৪ মাস বয়সে সা'দ গোত্রীয় বিবি হালিমা (রা) কর্তৃক লালিত-পালিত হন ও তাঁর দুধ পান করেন।

৫৭২ খ্রি: দুই বছর পর তিনি দুধ পান বন্ধ করেন। হালিমা (রা) তাঁকে নিয়ে মা আমিনার কাছে আসেন এবং পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যান।

৫৭৩-৭৫ খ্রি: তিন, চার ও পাঁচ বছর বয়সে সিনা চাক (হালিমা রাএর তত্ত্বাবধানে থাকা কালে)।

৫৭৫-৭৬ খ্রি: ৫-৬ বছর বয়সকালে জননী আমিনার কোলে ফিরে আসেন।

৫৭৬ খ্রি: ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে মদিনায় নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মা আমিনার ইন্তেকাল।

৫৭৮ খ্রি: ৮ বছরকালে আবদুল মুত্তালিবের ইনতিকাল।

৫৮২খ্রি: **১২** বছর ২ মাস বয়সে আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং বাহিরা খ্রিষ্টান-পাদ্রির সাক্ষাৎ লাভ।

৫৮৪-৮৫ খ্রি: **১৫** বছর বয়সে হারবুল ফিজার যুদ্ধের সূচনা। চাচাদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ।

৫৯১ খ্রি: ২১ বছর বয়সে যুদ্ধাবসানের পর হিলফুল ফুজুল গঠন।

৫৯৩-৯৪ খ্রি: ২৪ বছর বয়সে খাদিজা (রা)-এর বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবে সিরিয়া ও ইয়ামেন গমন।

৫৯৫ খ্রি: ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা)-এর সঙ্গে বিয়ে।

৬০০ খ্রি: ৩০ বছর বয়সে প্রথম কন্যা জয়নবের জন্ম এবং আল আমিন উপাধি লাভ।

৬০৫ খ্রি: ৩৫ বছর বয়সে কাবা পুনঃনির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসায় সালিস নির্বাচিত। হেরাগুহায় তাঁর ধ্যানমগ্ন জীবনের সূচনা।

৬০৫-০৯ খ্রি: যায়িদ ইবনুল হারিসা (রা)কে দাসত্ব জীবন থেকে মুক্ত করে নিজের পুত্র হিসেবে বরণ এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা।

৬১০ খ্রি: ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ। সকাল ও সন্ধ্যায় দৈনিক দুই ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ লাভ। (সূরা মু'মিন: ৫৫)

৬১০-১৩ খ্রি: নবুয়তের প্রথম তিনবছর গোপনে ইসলাম প্রচার।

৬১৪ খ্রি: আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দান। (সূরা শু'আরা: ২১৪) সকাল, সন্ধ্যা ও দুপুরে দৈনিক তিনওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ লাভ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি

আবু লাহাবের পাথর নিক্ষেপ ও সূরা লাহাব নাজিল। ইসলামের প্রথম শহীদ হারিস ইবন আবি হালা (রা)-এর শাহাদাত বরণ।

৬১৫ খ্রি: নবুওয়তের পঞ্চম বছরে উসমান (রা)-এর নেতৃত্বে ১৬ সাহাবির আবিসিনিয়ায় হিজরত। আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে শতাধিক সাহাবির হিজরত। উমর (রা) ও হামযা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৬১৭-১৯ খ্রি: বনু হাশিমসহ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি গণবয়কট আরোপ এবং শিয়াবে আবু তালিবে আবদ্ধ জীবন-যাপন।

৬১৯ খ্রি: নবুয়তের দশম বছরে মুহাররাম মাসে গণবয়কটের অবসান ও আবু তালিবের ইনতেকাল। রমজানে খাদিজা (রা)-এর ইনতেকাল। দাওয়াতি কাজে তায়েফ গমন এবং তায়েফবাসীর নির্মম অত্যাচার। ২৭ রজব ইসরা, মি'রাজ ও বক্ষবিদারণ। পাঁচওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার নির্দেশ লাভ।

৬২০খ্রি: ৬ জন খাযরাযীর সঙ্গে প্রথম বৈঠক। মদিনায় হিজরতের আভাস লাভ।(সূরা নাহল ৪১)

৬২১ খ্রি: ১২ জন মদিনাবাসীর উপস্থিতিতে আকাবার প্রথম বায়'আয়াত। মুস'আব ইবন উমায়র (রা)কে শিক্ষকরূপে মদিনায় প্রেরণ।

৬২২ খ্রি: ৭৫ জন মদিনাবাসীর উপস্থিতিতে আকাবার দ্বিতীয় বায়াত। মদিনা হিজরতের জন্য সাহাবিদের প্রতি নির্দেশ জারি (বুখারি)। **১২** সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কা ত্যাগ এবং গারে সাওরে আশ্রয় গ্রহণ। ৮ রবিউল আউয়াল সোমবার রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদিনার কুবায় পদার্পণ। **১২** রবিউল আউয়াল শুক্রবার জুম'আর পর মদিনায় প্রবেশ।

৬২৩ খ্রি: মসজিদে নববী নির্মাণ, ২ রাকায়াত বিশিষ্ট জোহর, আসর ও এশাকে ৪ রাকায়াতে রূপান্তর, আজানের সূচনা, মদিনার সনদ প্রবর্তন, সশস্ত্র সংগ্রামের বিধান ও সূচনা, উসমান ইবন মাজউন (রা) ও আসাদ আনসারী (রা)-এর ইনতেকাল। 'আবওয়া' বা 'ওয়াদ্দান' বুওয়াত যুদ্ধ, সাফওয়ান যুদ্ধ, যুল উশায়রা যুদ্ধ সংঘটিত।

৬২৩-২৪ খ্রি: কিবলা পরিবর্তন, রমজানের রোজার বিধান, সাদাকাতুল ফিতরের সূচনা, জাকাতের বিধান, ঈদের নামাজের সূচনা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা উসমান (রা)-এর স্ত্রী রুকাইয়া (রা)-এর ইনতেকাল। হজরত আলী ও ফাতিমা (রা)-এর বিয়ে। সালমান ফারসি (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৬২৪ খ্রি: ইবন জাহশ (রা)-এর নাখলা অভিযান; উমায়র (রা)-এর বানু খাতামা অভিযান; বদর যুদ্ধ; বনু কায়নুকা যুদ্ধ; সাবিক যুদ্ধ, আল কুদর যুদ্ধ; ইবনে মাসলামা কর্তৃক কা'ব ইবন আশরাফকে হত্যা; যূ আসর যুদ্ধ; বুহরান যুদ্ধ; যায়িদ (রা)-এর আল-কারাদা অভিযান; সা'দ ইবন যায়িদ (রা)-এর আল-গারা অভিযান; উহুদের যুদ্ধ; হামরাউল আসাদ যুদ্ধ।

৬২৪-২৫ খ্রি: উহুদ যুদ্ধে হামজা (রা)-এর শাহাদাত, মদ হারামের বিধান। হাসান (রা)-এর জন্ম। সুদের প্রতি প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা। ইয়াতিম সম্পর্কিত বিধান, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান ও দাম্পত্য বিধান প্রবর্তন।

৬২৫ খ্রি: আবু সালমা (রা)-এর অভিযান এবং মদিনায় ফিরে আসার পর তার শাহাদাত লাভ। ইবন নুবায়হকে হত্যার জন্য উনায়স (রা)-এর অভিযান, আল-মুনজির (রা)-এর বীরে মাউনা অভিযান। মারসাদ (রা) এবং আসিম (রা)-এর নেতৃত্বে রাজি অভিযান, বনু নাদির যুদ্ধ, নাজদ যুদ্ধ সংঘটিত।

৬২৫-২৬ খ্রি: হুসাইন (রা)-এর জন্ম। উম্মুল মু'মিনীন যায়নাব (রা)-এর ইনতেকাল। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে উম্মু সালমা (রা)-এর বিয়ে। এক ইয়াহুদি যুগলের প্রতি রজম আইনের বাস্তবায়ন। পর্দার বিধান, মদ নিষিদ্ধকরণের চূড়ান্ত বিধান জারি।

৬২৬ খ্রি: যাতুর রিকা যুদ্ধ। দুমাতুল জানদাল যুদ্ধ ও ইবন উরফাতাকে মদিনায় তার প্রতিনিধি নিয়োগ।

৬২৬-২৭ খ্রি: ফরজ হজের বিধান। ইফকের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে জয়নাব বিনত জাহাশ (রা)-এর বিয়ে। পর্দার বিধানের বাধ্যবাধকতা। (সূরা আহযাব: ৫৩, সূরা নূর: ৩০, ৩১) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে রাবিয়া বিনত আল হারিস (রা)-এর বিয়ে। তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন। জিনা, ব্যভিচার, অপবাদ, লি'আন প্রভৃতি ফৌজদারি আইনের প্রবর্তন।

৬২৭ খ্রি: ইবন মাসলামা (রা)-এর আল-কুরাতা অভিযান। আল মুরায়সি যুদ্ধ, খন্দক যুদ্ধ, লিহয়ান যুদ্ধ, আলগাবা যুদ্ধ এবং এই উভয় যুদ্ধকালে মদিনায় ইবন উম্মু মাকতুম (রা) কে তার প্রতিনিধি নিয়োগ।

৬২৭-২৮ খ্রি: আবিসিনিয়া, মিসর, পারস্য, রোম, বাহরাইন, ইয়ামামা, আম্মান প্রভৃতি দেশের শাসকদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পত্র প্রেরণ। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক 'আবওয়া'-এ দাফনকৃত মায়ের কবর জিয়ারত।

৬২৮ খ্রি: আবু বকর (রা) এবং জায়িদ (রা)-এর ওয়াদিউল কুররা অভিযান। ইবন রাওয়াহাত (রা)-এর খায়বার অভিযান। উকাল ও উরায়নার ঘটনা এবং কুরয ইবন জাবির (রা)-এর অভিযান। আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্যে আমর দামরি (রা)-এর অভিযান। ইবন মু'তাম (রা)-এর পশ্চিম উপকূল অভিযান। যায়িদ (রা)-এর অভিযান। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়াতুর রিদওয়ান। আবু বকর (রা)-এর নজদ অভিযান। বাশীর ইবন সা'দ (রা)-এর ফাদাক অভিযান।

৬২৮-২৯ খ্রি: মুতা বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা, গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে উম্মে হাবিবা (রা)-এর বিয়ে। খালিদ (রা), আমর (রা) প্রমুখের ইসলাম গ্রহণ। উমরাতুল কাযা সফরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে মায়মুনা (রা)-এর বিয়ে।

মিসরের সম্রাট আল-মুকাওকিশ কর্তৃক মারিয়া (রা)সহ বহু উপহারসামগ্রী রাসূলুল্লাহ (সা)কে প্রদান। জাবালা গাস্সানীর ইসলাম গ্রহণ। বিয়ে ও তালাকের বিস্তারিত বিধান প্রবর্তন।

৬২৯ খ্রি: গালিব (রা)-এর 'মায়ফাআ' অভিযান। আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহাহ্ (রা)-এর গাৎফান অভিযান। বাসির (রা)-এর ইয়ামান, 'জাবার জানাব' অভিযান। আবু হাদরাদ আসলামী (রা)-এর আলগাবা অভিযান। রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক উমরাতুল কাজা পালন। ইব্ন আবির আওজা (রা)-এর বানুর সুলায়ম অভিযান।

৬৩০ খ্রি: মক্কা বিজয়। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-এর নাখলা অভিযান। আমর ইবনুল আস (রা)-এর সুওয়া অভিযান। সা'দ ইবন যায়দ (রা)-এর আল মানাত অভিযান। হিশাম ইবনুল আ'স (রা)-এর ইয়ালামলাম অভিযান। খালিদ ইবন ওয়ালিদ (রা)-এর জাযিমা অভিযান, হুনায়ন যুদ্ধ, তায়েফ যুদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবিদের উমরা পালন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মদিনায় প্রত্যাবর্তন। মারিয়্যা (রা)-এর গর্ভে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহিম (রা)-এর জন্ম।

৬৩১ খ্রি: আবুবকর (রা) কে আমীরুল হজ করে মক্কায় প্রেরণ। ইসলামি শরিয়াহ মোতাবেক হজের বিধান প্রবর্তন। বাদশা নাজ্জাশির ইনতেকাল ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক তাঁর প্রতি গায়েবানা জানাজা আদায়। রাসূলুল্লাহ (রা)-এর কন্যা উসমান (রা)-এর স্ত্রী উম্মে কুলসুম (রা)-এর ইনতেকাল।

৬৩১-৩২ খ্রি: রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে মুসায়লামা কায্যাবের পত্র প্রেরণ। মদিনায় আরব প্রতিনিধিদলের আধিক্য, দলে দলে মানুষের ইসলাম গ্রহণ। কা'ব ইবন জুহায়র (রা)-এর ক্ষমা প্রার্থনা ও কবিতার জন্য পুরস্কার লাভ। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পুত্র ইবরাহিম (রা)-এর ইনতেকাল।

৬৩২ খ্রি: বিদায়হজ পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মক্কার উদ্দেশে মদিনা ত্যাগ। বিদায়হজ সম্পন্ন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন। মাথা ব্যথা ও জ্বরের সূচনা এবং সোমবার ১২ রবিউল আউয়াল মহানবী (সা)-এর ওফাত। বুধবার, ১৪ রবিউল আউয়াল ভোর রাতে দাফন সম্পন্ন।[https://bd.newmuslim.net/siratun-nad/]

১ম হিজরী: মাসজিদে নাববী নির্মাণ, আযান, ওযু-নামাজের নিয়ম ও জুমুআর নামাজ চালুকরণ। ভ্রাতৃত্ব স্থাপন ও ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি। সারিয়্যার মধ্যে সারিয়ায়ে সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী, সারিয়ায়ে রাবিগ বা রাবিগ অভিযান, সারিয়ায়ে খাবার।

২য় হিজরী: বদরের যুদ্ধ, যাকাত, রোজা, ঈদুল ফিতর। এছাড়াও বদর যুদ্ধের আগে গযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান, গাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব, গাযওয়ায়ে সাফওয়ান, গাযওয়ায়ে যুল উশাইরাহ, নাখলার অভিযান সংঘটিত হয়। বদর যুদ্ধের পর গাযওয়ায়ে বনু সুলাইম, সফওয়ানের

প্ররোচনায় রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র, গাযওয়ায়ে বনু কাইনুকা' ও গাযওয়ায়ে সাভীক সংঘটিত হয়।

৩য় হিজরী: উহুদ যুদ্ধের আগে সংঘটিত অভিযানসমূহ: গাযওয়ায়ে যু-আমর, কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা অভিযান, গাযওয়ায়ে বুহরান, সারিয়ায়ে যায়েদ ইবনে হারিসাহ। উহুদ যুদ্ধের পর হামরাউল আসাদ অভিযান সংঘটিত হয়।

৪র্থ হিজরী: আবু সালামাহ'র অভিযান, আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস রাযি. অভিযান, রাযী'র ঘটনা, বীরে মাউনার মর্মান্তিক ঘটনা, বনু নাযীর যুদ্ধ, নাজদ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৫ম হিজরী: গযওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল, গাযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক যুদ্ধ), বনু কুরাইযার যুদ্ধ, আবু রাফে' সাল্লাম ইবনে আবিল হুকাইকের হত্যা, পর্দার বিধান প্রবর্তিত হয়।

৬ষ্ঠ হিজরী: মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ'র অভিযান, গাযওয়ায়ে বনু লাহ্ইয়ান, গারে অভিযান, যুল-কাস্সাহতে মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ'র প্রথম অভিযান, যুল-কাস্সাহতে আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি. এর দ্বিতীয় অভিযান, জামূম অভিযান, ঈস অভিযান, তারিফ বা তারিক অভিযান, ওয়াদিল কুরা অভিযান, খাবাত অভিযান, গাযওয়ায়ে বনু মুসতালিক, আয়েশা রাযি. এর উপর অপবাদ, দিয়ারে বনু কালব অভিযান, ফাদাক অঞ্চলে অভিযান, ওয়াদিল কুরা অভিযান, উরানিয়্যীন অভিযান, যুলকা'দাহ মাসে হুদায়বিয়াহ'র সন্ধি।

৭ম হিজরী: ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ দিকে বা সপ্তম হিজরীর প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশাদের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়, খায়বার বিজয়, খায়বার বিজয়ের পর ফাদাক, ওয়াদিল কুরা, তাইমা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যাতুর রিকা' যুদ্ধ, কুদাইদ অভিযান, হিস্মা অভিযান, তুরাবাহ অভিযান, ফাদাক অঞ্চল অভিমুখে অভিযান, মাইফাআহ অভিযান, খায়বার অভিযান, ইয়ামান ও জাবার অভিযান, গাবাহ অভিযান, কাযা উমরাহ, মায়মুনাহ রাযি. কে বিবাহ, মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা।

৮ম হিজরী: সারিয়ায়ে গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি., সারিয়ায়ে কা'ব ইবনে উমায়ের রাযি., সারিয়ায়ে আবু উবায়দাহ ইবনে জাররাহ রাযি., মুতার যুদ্ধ, যাতুস সালাসিল অভিযান, খাযিরাহ অভিযান, মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধে ও তায়েফে ইসলামের বিজয়।

৯ম হিজরী: রজব মাসে তাবুক অভিযান সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের পরে উম্মে কুলসুম রাযি. ইন্তেকাল করেন, যুলকা'দাহ মাসে আবু বকর রাযি. এর নেতৃত্বে হাজ্ব কাফেলা প্রেরণ করা হয়। এ সময় রাসূল এর নিকট প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটে।

১০ম হিজরী: ১ লাখেরও বেশি সাহাবীসহ রাসূল এর বিদায় হাজ্বে আরাফাতের ময়দানে মানব জাতির জন্য দিক নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণ দান।

১১শ হিজরী/৬৩২ খ্রিস্টাব্দ: রাসূল এর মাথা ব্যাথা ও জ্বরের সূচনা। ৬৩ বছর ৪ দিন বয়সে ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার রাসূল এর ওফাত হয়। বুধবার ১৪ই রবিউল আউয়াল ভোর রাতে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

রাসুল (সা.) যে বর্ণাঢ্য ও শানদার জীবন কাটিয়ে গেছেন, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ ছোট্ট পরিসরে কখনোই ধারণ করা সম্ভব নয়। এখানে কেবল তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক বছরের স্মরণীয় ও বড় ঘটনার দিকে ইশারা করা হয়েছে। নবীজি (সা.)-এর বর্ণাঢ্য জীবন পুরোপুরি জানতে হলে বৃহৎ কলেবরের নির্ভরযোগ্য সিরাত গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন সকল প্রকার মানবিক গুণে গুণান্বিত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধু ও শত্রু সকলের মুখে সমভাবে তাঁর অনুপম চরিত্র মাধুর্যের প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে। কঠোর প্রতিপক্ষ আবু সুফিয়ান সম্রাট হেরাক্লিয়াসের সম্মুখে অকুণ্ঠ চিত্তে তাঁর সততা, আমানতদারী ও সচ্চরিত্রতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন (বুখারী হা/৭)। আল্লাহপাক নিজেই স্বীয় রাসূলের প্রশংসায় বলেন, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ‘নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী’ (ক্বলম ৬৮/৪)। রাসূল (সাঃ) বলেন, بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ‘আমি প্রেরিত হয়েছি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য’।[1] তাই দেখা যায়, নবুঅত-পূর্ব জীবনে সকলের নিকটে প্রশংসিত হিসাবে তিনি ছিলেন ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত, আমানতদার) এবং নবুঅত পরবর্তী জীবনে চরম শত্রুতাপূর্ণ পরিবেশেও তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতা, সাহস ও দৃঢ়চিত্ততা, দয়া ও সহমর্মিতা, পরোপকার ও পরমত সহিষ্ণুতা, লজ্জা ও ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি অনন্য গুণাবলীর জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا‘নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে ও অধিকহারে আল্লাহকে স্মরণ করে’ (আহযাব ৩৩/২১)। তাঁর অনুপম চরিত্রমাধুর্য ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পূর্ণভাবে বর্ণনা করা ঐরূপ অসম্ভব, যেরূপ পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য বর্ণনা করা এবং খালি চোখে

আকাশের তারকারাজি গণনা করা অসম্ভব। তবুও দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু চারিত্রিক নমুনা ও বৈশিষ্ট্য নিম্নে তুলে ধরা হ’ল।-

(১) বাকরীতি (تعبير الكلام) : তিনি হাসিমুখে বিশুদ্ধ, মার্জিত ও সুন্দরভাবে কথা বলতেন। যা দ্রুত শ্রোতাকে আকৃষ্ট করত। আর একেই লোকেরা ‘জাদু’ বলত। তাঁর উন্নত ও শুদ্ধভাষিতায় মুগ্ধ হয়েই ইয়ামনের যেমাদ আযদী মুসলমান হয়ে যান।[2] নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ‘তিনি ছিলেন আরব ও অনারবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ’।[3] এমনকি ‘হাদীছ জাল হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হ’ল তার শব্দসমূহের উচ্চ মানবিশিষ্ট না হওয়া’ (ফাৎহুল মুগীছ)। একারণেই আরবী সাহিত্যে কুরআন ও হাদীছের প্রভাব সবার উপরে। বরং বাস্তব কথা এই যে, এই ভাষার বুকে কুরআন ও হাদীছের অবস্থানের কারণেই তা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর কুরআন ও হাদীছের সর্বোচ্চ বাকরীতি ও আলংকরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হ’তে পেরেছে এবং ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। অথচ হিব্রু, খালেদী, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ভাষা সমূহ বিলুপ্ত হয়ে গেছে অথবা বিলুপ্তির পথে।

(২) ক্রোধ দমন শৈলী (أسلوب كظم الغيظ) : ক্রোধ দমনের এক অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর মধ্যে। তিনি বলতেন, প্রকৃত বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে দমন করতে পারে।[4] আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি কখনো কাউকে নিজের স্বার্থে নিজ হাতে মারেননি। কোন মহিলা বা খাদেমকে কখনো প্রহার করেননি’।[5]

(৩) হাসি-কান্না (الضحك والبكاء) : তিনি মৃদু হাস্য করতেন। কখনোই অট্টহাস্য করতেন না। সদা প্রফুল্ল থাকতেন। কখনোই গোমড়ামুখো থাকতেন না। তবে দুশ্চিন্তায় পড়লে তার ছাপ চেহারায় পড়ত এবং তখন তিনি ছালাতে রত হ’তেন।[6] ছোটখাট হালকা রসিকতা করতেন। যেমন, (ক) একদিন স্ত্রী আয়েশার নিকটে এসে তার এক বৃদ্ধা খালা রাসূল (সাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দো‘আ করুন যেন তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে অমুকের মা! কোন বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একথা শুনে উক্ত মহিলা কাঁদতে শুরু করল। তখন আয়েশা বললেন, তাদের কি দোষ? জবাবে রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি কি কুরআনে পড়োনি যে আল্লাহ বলেছেন, إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً- فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا- عُرُبًا أَتْرَابًا- لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ‘আমরা জান্নাতী নারীদের বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি’। ‘অতঃপর তাদের চিরকুমারী করেছি’। সদা সোহাগিনী, সমবয়স্কা’। ‘ডান সারির লোকদের জন্য’ (ওয়াক্বি‘আহ ৫৬/৩৫-৩৮)।[7] অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সবাই ৩০ থেকে ৩৩ বছর বয়সী হবে’।[8]

(খ) এক সফরে তিনি দেখেন যে, মহিলাদের নিয়ে তাঁর কৃষ্ণকায় উষ্ট্রচালক গোলাম আনজাশাহ দ্রুত গতিতে উট হাঁকিয়ে চলেছে। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন, رُوَيْدَكَ يَا

أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ الْقَوَارِيرَ‘ধীরে চালাও হে আনজাশা! কাঁচের পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেল না’।[9]
(গ) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) আমাদের সঙ্গে মিশতেন। এমনকি আমার ছোট ভাই আবু ওমায়ের একটি ‘নুগায়ের’ অর্থাৎ লাল ঠোঁট ওয়ালা চড়ুই জাতীয় পাখি পুষত। যা নিয়ে সে খেলা করত। রাসূল (সাঃ) যখন এসে তাকে খেলতে দেখতেন, তখন বলতেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ‘হে আবু ওমায়ের! কি করছে তোমার নুগায়ের?[10]
ছালাতের মধ্যে বিশেষ করে তাহাজ্জুদের ছালাতে তিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে তার অন্তর কেঁদে উঠতো এবং তার অভাব দূরীকরণে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। চাচা হামযা, কন্যা যয়নব ও পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুতে তিনি শিশুর মত হু হু করে কেঁদেছিলেন। তিনি অন্যের মুখে কুরআন শুনতে পসন্দ করতেন। একবার ইবনু মাসঊদের মুখে সূরা নিসা শুনে তাঁর চোখ বেয়ে অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিত হয়। অতঃপর ৪১ আয়াতে পৌঁছলে তিনি তাকে থামতে বলেন।[11]

(8) বীরত্ব ও ধৈর্যশীলতা (الشجاعة والصبر) : কঠিন বিপদের মধ্যেও তিনি দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হ’তে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (সাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন (আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহোদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (সাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও (يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِى مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ)। তখন রাসূল (সাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন’।[12]
উক্ত ঘটনায় রাসূল (সাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

(৫) সেবা পরায়ণতা (عيادة المرضى) : কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে সেবা করতেন ও সান্ত্বনা দিতেন। তার জন্য দো'আ করতেন। কি খেতে মন চায় শুনতেন। ক্ষতিকর না হ'লে তা দেবার ব্যবস্থা করতেন। নিজের ইহূদী কাজের ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার বাড়ীতে গিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেন ও পরিচর্যা করেন। এ সময় তিনি বলেন, তুমি ইসলাম কবুল কর। তখন ছেলেটি তার বাপের দিকে তাকাল যে তার নিকটে বসা ছিল। বাপ তাকে বলল, أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ'তুমি আবুল ক্বাসেম-এর কথা মেনে নাও। তখন ছেলেটি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। অতঃপর মারা গেল। এরপর রাসূল (সাঃ) বের হবার সময় বললেন الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَنْقَذَهُ بِىْ مِنَ النَّارِ'আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা, যিনি তাকে আমার মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিলেন'।[13]

(৬) সহজ পন্থা অবলম্বন (اتخاذ الطريقة السهلة) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-কে যখনই দু'টি কাজের এখতিয়ার দেওয়া হ'ত, তখন তিনি সহজটি বেছে নিতেন। যদি তাতে গুনাহের কিছু না থাকত। তিনি নিজের জন্য কোন অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু আল্লাহর জন্য হ'লে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়তেন না'।[14] ওয়ায-নছীহত করতেন, যতক্ষণ না মানুষ বিব্রতবোধ করে।[15] নফল ছালাত চুপে চুপে আদায় করতেন, যাতে অন্যের কষ্ট না হয়। তিনি বলতেন, فَاكْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ'তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের সাধ্যে কুলায়'।[16]

(৭) দানশীলতা (الجود) : যতক্ষণ তাঁর কাছে কিছু থাকত, ততক্ষণ তিনি দান করতেন। রামাযান মাসে তা হয়ে যেত كَالرِّيْحِ الْمُرْسَلَةِ'প্রবহমাণ বায়ুর মত'। তিনি ছাদাক্বা গ্রহণ করতেন না। কিন্তু হাদিয়া নিতেন। অথচ তা নিজের প্রয়োজনে যৎসামান্য ব্যয় করে সবই দান করে দিতেন। তিনি বলতেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ'কেউ অতক্ষণ প্রকৃত মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে অপরের জন্য তাই-ই ভালবাসবে, যা সে নিজের জন্য ভালবাসে'।[17] তিনি বলতেন, وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا'একজন বান্দার হৃদয়ে ঈমান ও কৃপণতা কখনো একত্রিত হ'তে পারে না'।[18]

(৮) লজ্জাশীলতা (الحياء) : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বদা দৃষ্টি অবনত রাখতেন। কখনোই অন্যের উপরে নিজের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন না। তিনি কারু মুখের উপর কোন অপছন্দনীয় কথা বলতে লজ্জা পেতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِى خِدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِى وَجْهِهِ-'তিনি পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চাইতে অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। যখন তিনি কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারা দেখে আমরা বুঝে নিতাম'।[19] কারু কোন মন্দ কাজ দেখলে সরাসরি তাকে মন্দ না বলে সাধারণভাবে নিষেধ করতেন, যাতে লোকটি লজ্জা না পায়। অথচ বিষয়টি বুঝতে পেরে সে নিজেই সংশোধন হয়ে যায়।

(৯) বিনয় ও নম্রতা (التواضع والتذلل) : তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নিরহংকার চরিত্রের মানুষ। তিনি সবাইকে মানুষ হিসাবে সমান জ্ঞান করতেন। উঁচু-নীচু ভেদাভেদ করতেন না। তাঁকে দেখে সম্মানার্থে দাঁড়াতে ছাহাবীগণকে নিষেধ করতেন।[20] দাস-দাসীদের নিকটে কখনোই অহংকার প্রকাশ করতেন না। তাদের কোন কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে উহ্ শব্দটি করতেন না। বরং তাদের কাজে নিজে সাহায্য করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ১০ বছর রাসূল (সাঃ)-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কখনো আমাকে কোন কাজের জন্য কৈফিয়ত তলব করেননি।[21] অবশ্য তার অর্থ এটা নয় যে, অন্যায় কথা বা কাজের জন্য তিনি কাউকে ধমকাতেন না বা ভৎর্সনা করতেন না। যেমন তিনি উসামা ও খালেদকে ধমকিয়েছেন এবং তাদের ব্যাপারে তিনি দায়ী নন বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়েছেন।[22] তিনি সর্বদা আগে সালাম দিতেন ও মুছাফাহার জন্য আগে হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছাহাবীগণকে সম্মান করে অথবা আদর করে কখনো কখনো তাদের উপনামে ডাকতেন। যেমন আব্দুল্লাহ বিন ওছমানকে তার উপনামে 'আবুবকর', আব্দুর রহমান বিন ছাখারকে 'আবু হুরায়রা' (ছোট বিড়ালের বাপ), আলীকে 'আবু তোরাব' (ধূলি ধুসরিত), হুযায়ফাকে 'নাওমান' (ঘুম কাতর), অতি সতর্ক ও সাবধানী হওয়ার কারণে আনাসকে 'যুল উযনাইন' (দুই কান ওয়ালা), সফরে অধিক বোঝা বহনকারী হিসাবে মুক্তদাস মিহরান বিন ফার্রূখ-কে 'সাফীনাহ' (নৌকা) বলে ডাকতেন।[23] উল্লেখ্য যে, খুশী অবস্থায় উপনামে ডাকা আরবীয় রীতি হিসাবে প্রসিদ্ধ।

(ক) দুগ্ধদায়িনী মা, রোগী, বৃদ্ধ, মুসাফির ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি জামা'আতে সালাত সংক্ষেপ করতেন।[24]

(খ) রাসূল (সাঃ)-এর 'আযবা' (الْعَضْبَاءُ) নাম্নী একটা উষ্ট্রী ছিল। সে এতই দ্রুতগামী ছিল যে, কোন বাহন তাকে অতিক্রম করতে পারত না। কিন্তু একদিন এক বেদুঈনের সওয়ারী আযবা-কে অতিক্রম করে গেল। বিষয়টি মুসলমানদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হ'ল। তখন রাসূল (সাঃ) তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَضَعَهُ 'দুনিয়াতে আল্লাহর নীতি এটাই যে, কাউকে উঁচু করলে তাকে নীচুও করে থাকেন'।[25]

(গ) জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (সৃষ্টির সেরা) বলে সম্বোধন করলে তিনি তাকে বলেন, ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ 'তিনি হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)'।[26]

(ঘ) একবার এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ)-এর সামনে এসে ভয়ে বিহবল হয়ে পড়ে। তখন তিনি তাকে বলেন, هَوِّنْ عَلَيْكَ فَإِنِّىْ لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ 'স্থির হও! আমি কোন বাদশাহ নই। আমি একজন কুরায়েশ মহিলার সন্তান মাত্র। যিনি শুকনা মাংস ভক্ষণ করতেন'।[27] উল্লেখ্য যে, আরবের গরীব লোকেরা শুকনা মাংস খেতেন। এ সকল

ঘটনায় বাস্তব জীবনে রাসূল (সাঃ)-এর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ও নিরহংকার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে।

(১০) সংসার জীবনে (فى حياته العائلية) : হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ও কাপড়ে তালি লাগাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, সংসারের কাজ নিজ হাতে করতেন, নিজে বকরী দোহন করতেন, কাপড় ছাফ করতেন ও নিজের কাজ নিজে করতেন'।[28]

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) ছিলেন কুমারী ও সবচেয়ে কম বয়স্কা। তাই রাসূল (সাঃ) কখনো কখনো সাথীদের এগিয়ে দিয়ে নিজে তার সাথে দৌড়ে পাল্লা দিতেন। তাতে আয়েশা জিতে যেতেন। আবার আয়েশা ভারী হয়ে গেলে প্রতিযোগিতায় তিনি হেরে যান'।[29] তাকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে বেদুঈন মেয়েদের নাচ-গান শুনেছেন।[30] রাসূল (সাঃ) যে কত বাস্তববাদী ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন, এতে তার প্রমাণ মেলে। খায়বর যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নব পরিণীতা স্ত্রী ছাফিইয়াকে উটে সওয়ার করার জন্য তিনি নীচু হয়ে নিজের হাঁটু পেতে দেন। অতঃপর ছাফিইয়াহ নবীর হাঁটুর উপরে পা রেখে উটে সওয়ার হন'।[31]

(১১) সমাজ জীবনে (فى حياةه الإجةماعية) : বন্ধুদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন। নিজের ও স্ত্রী সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক রক্ষা করতেন। কারু ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ হ'তে দূরে থাকতেন। পরনিন্দা ও পরচর্চা হতে বেঁচে থাকতেন। সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ-খবর নিতেন। তিনি শত্রুদের দেওয়া কষ্টে ও মূর্খদের বাড়াবাড়িতে ধৈর্য ধারণ করতেন। তিনি মন্দকে মন্দ বলতেন ও ভালকে ভাল বলতেন। কিন্তু সর্বদা মধ্যপন্থী আচরণ করতেন।[32] তিনি সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন। তাঁর নিকটে লোকেদের মর্যাদার ভিত্তি ছিল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা (আহমাদ হা/২৩৫৩৬)। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর প্রতি তাঁর করুণা ছিল সর্বাধিক। তিনি বলতেন, اَبْغُونِىْ فِي الضُّعَفَاءِ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা আমাকে দুর্বল শ্রেণীর মধ্যে তালাশ করো। কেননা তোমরা রূযিপ্রাপ্ত হয়ে থাক এবং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে থাক দুর্বল শ্রেণীর মাধ্যমে'।[33] অর্থাৎ তাদের প্রতি সদাচরণের মাধ্যমে তোমরা আমার সন্তুষ্টি তালাশ কর।

সমাজ সংস্কারে তিনি জনমতের মূল্যায়ন করতেন। যেমন-

(১) কুরায়েশদের নির্মিত কা'বাগৃহে ইবরাহীম (আঃ) নির্মিত কা'বাগৃহ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছিল। ছাড়া অংশটিকে 'রুকনে হাত্বীম' বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) চেয়েছিলেন ওটাকে ইবরাহীমী ভিতের উপর কা'বাগৃহের মধ্যে শামিল করতে এবং কা'বাগৃহের দু'টো দরজা করতে। কিন্তু জনমত বিগড়ে যাবার ভয়ে তিনি তা করেননি। এবিষয়ে তিনি একদিন আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, لَوْلاَ قَوْمُكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُوْنَ 'যদি তোমার কওম নওমুসলিম না হ'ত, তাহ'লে আমি

কা‘বা ভেঙ্গে দিতাম এবং এর দু’টি দরজা করতাম। একটি দিয়ে মুছল্লীরা প্রবেশ করত এবং অন্যটি দিয়ে বেরিয়ে যেত। কিন্তু কুরায়েশরা তা না করে অনেক উঁচুতে দরজা নির্মাণ করে। যাতে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ সেখানে প্রবেশ করতে না পারে। পরবর্তীতে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (৬৪-৭৩ হি.) সেটি করেন’।[34]

(২) তিনি সাধ্যপক্ষে উম্মতের ঐক্য রক্ষার চেষ্টা করতেন। যেমন মুনাফিকদের অপতৎপরতা সীমা ছাড়িয়ে গেলে ওমর ফারূক (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে বলেন, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকটাকে (ইবনু উবাইকে) শেষ করে দিই। জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন, না। তাতে লোকেরা বলবে যে, মুহাম্মাদ তার সাথীদের হত্যা করছেন’।[35]

(৩) তিনি লোকদের সাথে নম্র আচরণ করতেন। বৈঠকে তিনি কোনরূপ অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। বেদুঈনদের রূঢ় আচরণে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করতেন। বলা চলে যে, তাঁর এই বিনয়ী ব্যবহার ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল। আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ‘আর আল্লাহর রহমতেই তুমি তাদের প্রতি (অর্থাৎ স্বীয় উম্মতের প্রতি) কোমলহৃদয় হয়েছ। যদি তুমি কর্কশভাষী ও কঠোর হৃদয়ের হ’তে, তাহ’লে তারা তোমার পাশ থেকে সরে যেত’ (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। রাসূল (সাঃ)-এর এই অনন্য চরিত্র মাধুর্য ছিল নিঃসন্দেহে আল্লাহর বিশেষ দান।

[1]. হাকেম হা/৪২২১; ছহীহাহ হা/৪৫, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

[2]. মুসলিম হা/৮৬৮ (৪৬); মিশকাত হা/৫৮৬০।

[3]. মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল মুলহিম শারহু মুসলিম ১৬ পৃঃ।

[4]. বুখারী হা/৬১১৪; মুসলিম হা/২৬০৯ (১০৭); মিশকাত হা/৫১০৫ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ২০ অনুচ্ছেদ।

[5]. মুসলিম হা/২৩২৮ (৭৯); মিশকাত হা/৫৮১৮।

[6]. আবুদাঊদ হা/১৩১৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭০৩; মিশকাত হা/১৩২৫।

[7]. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ওয়াক্বি‘আহ ৩৫-৩৮ আয়াত; রাযীন, মিশকাত হা/৪৮৮৮, সনদ ছহীহ ‘শিষ্টাচার সমূহ’ অধ্যায় ‘ঠাট্টা করা’ অনুচ্ছেদ।

[8]. তিরমিযী হা/২৫৪৫; আহমাদ হা/২২১৫৯; ছহীহাহ হা/২৯৮৭; মিশকাত হা/৫৬৩৯।

[9]. বুখারী হা/৬২১১; মুসলিম হা/২৩২৩; মিশকাত হা/৪৮০৬।

[10]. বুখারী হা/৬১২৯; মুসলিম হা/২১৫০ (৩০); মিশকাত হা/৪৮৮৪ ‘ঠাট্টা করা’ অনুচ্ছেদ।

[11]. বুখারী হা/৫০৫০; মুসলিম হা/৮০০; মিশকাত হা/২১৯৫।

[12]. বুখারী হা/৬০৮৮; মুসলিম হা/১০৫৭; মিশকাত হা/৫৮০৩ ‘ফাযায়েল ও শামায়েল’ অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

[13]. আবুদাঊদ হা/৩০৯৫; বুখারী হা/১৩৫৬; মিশকাত হা/১৫৭৪ 'জানায়েয' অধ্যায় ১ অনুচ্ছেদ।

[14]. বুখারী হা/৬১২৬; মুসলিম হা/২৩২৭; মিশকাত হা/৫৮১৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ।

[15]. বুখারী হা/৬৪১১; মুসলিম হা/২৮২১; মিশকাত হা/২০৭।

[16]. বুখারী হা/১৯৬৬ 'ছওম' অধ্যায়-৩০ 'ছওমে বেছালে বাড়াবাড়ির শাস্তি' অনুচ্ছেদ-৪৯।

[17]. বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫ (৭২); মিশকাত হা/৪৯৬১ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ।

[18]. তিরমিযী হা/১৬৩৩; নাসাঈ হা/৩১০৮; মিশকাত হা/৩৮২৮ 'জিহাদ' অধ্যায়।

[19]. বুখারী হা/৬১০২; মুসলিম হা/২৩২০; মিশকাত হা/৫৮১৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ

[20]. তিরমিযী হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৪৬৯৮।

[21]. বুখারী হা/৬০৩৮; মুসলিম হা/২৩০৯; মিশকাত হা/৫৮০১।

[22]. মুসলিম হা/৯৬; বুখারী হা/৪৩৩৯।

[23]. আবু হুরায়রা (তিরমিযী হা/৩৮৪০); আবু তোরাব (বুখারী হা/৬২০৪); নাওমান (মুসলিম হা/১৭৮৮ (৯৯); যুল-উযনাইন (আবুদাঊদ হা/৫০০২; তিরমিযী হা/১৯৯২; মিশকাত হা/৪৮৮৭); সাফীনাহ (আহমাদ হা/২১৯৭৮, সনদ হাসান; হাদীছের প্রথমাংশ মিশকাত হা/৫৩৯৫)।

[24]. বুখারী হা/৭০৩; মুসলিম হা/৪৬৭ (১৮৩); মিশকাত হা/১১৩১, ৩৪, ২৯।

[25]. বুখারী হা/৬৫০১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়-৮১ 'নম্রতা' অনুচ্ছেদ-৩৮।

[26]. মুসলিম হা/২৩৬৯; মিশকাত হা/৪৮৯৬ 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ।

[27]. ইবনু মাজাহ হা/৩৩১২; ছহীহাহ হা/১৮৭৬।

[28]. আহমাদ হা/২৬২৩৭; মিশকাত হা/৫৮২২ সনদ ছহীহ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়।

[29]. ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৯; ছহীহাহ হা/১৩১।

[30]. বুখারী হা/৫১৯০; মুসলিম হা/৮৯২ (১৮); মিশকাত হা/৩২৪৪; বুখারী হা/৫১৪৭; মিশকাত হা/৩১৪০।

[31]. বুখারী হা/৪২১১ 'খায়বর যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ ।

[32]. বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬।

[33]. আবুদাঊদ হা/২৫৯৪; মিশকাত হা/৫২৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭৯।

[34]. বুখারী হা/১২৬ 'ইলম' অধ্যায়-৩, অনুচ্ছেদ-৪৮; ঐ, হা/১৫৮৪ 'হজ্জ' অধ্যায়-২৫, অনুচ্ছেদ-৪২। [35]. তিরমিযী হা/৩৩১৫ সনদ ছহীহ ।(https://www.hadithbd.com)

সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সুন্নাহ আকড়ে ধরেছিলেন।

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرً
সূরাতুল আহযাবের একটি বিখ্যাত আয়াত তিলাওয়াত করা হল, সূরা : ৩৩, আয়াত : ২১। এই আয়াতে আল্লাহ পাক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে, তিনি আল্লাহভীরুদের 'উসওয়ায়ে হাসানা' উত্তম আদর্শ। রাসূল এবং পয়গম্বর যিনি হন, তিনি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য আদর্শ নিয়ে আসেন এবং আদর্শ হয়ে আসেন। আল্লাহ পাক তাঁর হেদায়েত ও পথনির্দেশ পৌঁছাবার জন্য মানবজাতির মধ্য থেকে তাঁর কিছু বিশিষ্ট বান্দাকে নির্বাচন করেন এবং তাঁদের মাধ্যমে তাঁর পথনির্দেশ বান্দাদের কাছে প্রেরণ করেন। হযরত আদম আ. থেকে নবী ও রাসূলের এই ধারা আরম্ভ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। সূরাতুল বাকারায় আছে, হযরত আদম আ.-কে লক্ষ করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, যখন তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়- **اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا۔ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.** অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীতে নেমে যাও, এরপর আমার পক্ষ থেকে যদি তোমাদের নিকট হেদায়েত ও পথনির্দেশ আসে তো যারা এই পথনির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। -সূরা বাকারা (২) : ৩৮ তো আল্লাহ তাআলা হযরত আদম আ.-এর মাধ্যমে হেদায়েত পাঠানোর ধারা শুরু করেছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সেই ধারাকে পূর্ণাঙ্গ ও সমাপ্ত করেছেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জীবনের শেষ দিকে বিদায় হজ্বের সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই আয়াত নাযিল হয়েছে- **اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.** আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম। তোমাদের উপর আমার নিআমতকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম। -সূরা মায়েদা (৫) : ৩ এটা হল আদম আ. থেকে নবী ও রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পথনির্দেশ প্রেরণের যে ধারার সূচনা হয়েছিল সেই ধারার সমাপ্তি। আল্লাহ তাআলা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন। এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বীনই অনুসরণীয়, সকল মানুষের জন্য অনুকরণীয়। নবী ও রাসূলগণ নিছক 'বার্তাবাহক' ছিলেন না; বরং তাঁরা ছিলেন ঐ আসমানী বার্তার বাস্তব নমুনাও। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছে যে শিক্ষা ও বিধান পাঠিয়েছেন তাঁরা ছিলেন ঐ শিক্ষার বাস্তব নমুনা। আম্বিয়ায়ে কেরাম তাওহীদ-রিসালাত ও আখিরাতের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর এইসব বিষয়ের প্রতি তাঁদের ঈমানই ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। তাঁরা আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছেন আর তাঁরাই ছিলেন সবচেয়ে বড় আবেদ। তারা বান্দার হকের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর বান্দার হক কীভাবে আদায় করতে

হয় তা তাদের কর্ম দ্বারা দেখিয়ে গেছেন। তারা উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন আর তারাই ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। এভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত শিক্ষা ও বিধানের তাঁরা ছিলেন বাস্তব নমুনা। কুরআন মাজীদে আম্বিয়ায়ে কেরামের গুণাবলী এবং তাঁদের দাওয়াতের যে ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে তা এই বাস্তবতার দলীল। কুরআনের সেই বৃত্তান্ত এক মধুর দৃষ্টান্ত। হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাভী রাহ.-এর ভাষায় কুরআন যখন আম্বিয়ায়ে কেরামের গুণাবলী বয়ান করে তখন যেন মনভরে প্রিয়ের কাহিনী বর্ণনা করে। তো সূরাতুল আহযাবের এই বিখ্যাত আয়াতে 'তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ'। এতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহান বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর বাণী ও বিধান মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। আর তাঁর গোটা জীবন ও কর্ম ছিল তারই বাস্তব নমুনা। তাঁর অনুকরণের মাধ্যমেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করা সম্ভব। এরপর বলা হয়েছে, এই আদর্শ তাদের জন্য, অর্থাৎ এই আদর্শ দ্বারা তারাই উপকৃত হবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করে। আর শেষ দিবসকে ভয় করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। নবী-আদর্শ দ্বারা উপকৃত কারা হয় তিনি সবার 'উসওয়া' ও আদর্শ। কিন্তু বাস্তবে এই উসওয়া দ্বারা উপকৃত তারাই হবে, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আখেরাতকে ভয় করে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা করে এবং আখেরাতে নাজাতের প্রত্যাশা করে। আর সে কারণে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে। দেখুন, কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রেও এই কথা। কুরআন নাযিল হয়েছে সকল মানুষের জন্য। কিন্তু কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় তারাই, যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে। সুরাতুল বাকারার শুরুতে কুরআনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে- **هدى للمتقين** অর্থাৎ এই কিতাব মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত; কুরআন যদিও নাযিল হয়েছে সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য কিন্তু বাস্তবে এই কুরআনের মাধ্যমে তারাই হেদায়েত পাবে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। হযরত শায়খুল হিন্দ রাহ. বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে সেই তো আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ তালাশ করবে আর তখন সে কুরআনে পেয়ে যাবে কোন্ কাজ আল্লাহর পছন্দ আর কোন্ কাজ অপছন্দ। অন্তরের খোদাভীতি ও আল্লাহর রেযামন্দির অন্বেষার কারণে সে কুরআনের বিধান মোতাবেক চলবে এবং দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ লাভ করবে। তো কুরআন যদিও নাযিল হয়েছে সকল মানুষের হেদায়েতের জন্য কিন্তু বাস্তবে তারাই কুরআন দ্বারা সুপথপ্রাপ্ত হবে, যাদের মনে আল্লাহর ভয় আছে। তো কুরআন সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কেও একই কথা। কুরআন দ্বারা যেমন শুধু তারাই সুপথপ্রাপ্ত হয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে তেমনি আল্লাহর রাসূলের উসওয়া দ্বারাও তারাই উপকৃত হয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্য প্রত্যাশা করে। এখান থেকে

কয়েকটি বিষয় বের হয়ে আসে। প্রথম বিষয় হল, কুরআনের বাণী সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য, কুরআন থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য, তেমনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও জীবনাদর্শ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য, সীরাত থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও তাকওয়া। আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান, আল্লাহর ভয়, আখেরাতের ভয়। কুরআন মাজীদ যখন নাযিল হচ্ছিল তখন কিছু মানুষের অবস্থা এই ছিল যে, কুরআনের আয়াতসমূহ নাযিল হচ্ছে আর তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কুরআনের নতুন নতুন বাণী ও বিধান আসছে আর তাদের আনুগত্য বাড়ছে, ইলম ও হিকমতের নতুন নতুন দিগন্ত তাদের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি বাণী, একেকটি কর্ম, তাঁর পবিত্র জীবনের একেকটি অধ্যায় তাঁদের সামনে প্রকাশিত হচ্ছে আর তাদের ঈমান বাড়ছে। এরা হচ্ছেন ঐ সকল সৌভাগ্যবান, যাঁদের আল্লাহ ঈমান দান করেছিলেন, ফলে ঈমানের আলোয় তাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উন্মুক্ত ও আলোকিত ছিল। অন্যদিকে কিছু লোক এমনও ছিল, যখনই কুরআন মাজীদের কোনো আয়াত নাযিল হয়েছে তাদের কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বাণী ও কর্ম সামনে এসেছে, তাদের কুফর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই আয়াতকে তারা অস্বীকার করেছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মকে অবজ্ঞা করেছে, এভাবে তাদের কুফর উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এই দুই সম্প্রদায়ের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কাজেই কিতাব ও সুন্নাহ থেকে উপকৃত হওয়ার সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে, ঈমান ও তাকওয়া। ঈমান ও তাকওয়া থাকলে কুরআন তাকে পথ দেখাবে। সীরাত ও সুন্নাহ তাকে পথ দেখাবে। এজন্য ঈমান শিখতে হয়, অর্জন করতে হয়। সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন- **تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمّ تَعَلّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا**. আমরা ঈমান শিখেছি। এরপর কুরআন শিখেছি। ফলে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৬১ প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে বলে রাখি। কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়নের একটি স্বাভাবিক পন্থা আছে। সেই পন্থা এই নয় যে, একজন মানুষ হঠাৎ করে কুরআন মাজীদের কিছু তরজমা সংগ্রহ করল, হাদীসের কিছু কিতাবের তরজমা সংগ্রহ করল এবং পড়া শুরু করে দিল। যা বুঝে আসল একেই কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা মনে করল। জগতের কোনো বিষয়ের অধ্যয়নেরই এটা স্বাভাবিক পন্থা নয়। যে কোনো বিষয়েরই অধ্যয়নের স্বাভাবিক পন্থা হল, যারা ঐ বিষয়ের বিজ্ঞ-পারদর্শী তাদের কাছ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা। ঐ শাস্ত্রের সাথে চিন্তা ও রুচির আত্মীয়তা সৃষ্টি করা। এরপর বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ অনুসারে অধ্যয়ন করা এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া। এ কারণে কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহকদের নিকট থেকেই কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাগুলো আগে গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের মৌলিক শিক্ষা কী,

রুচি ও চেতনা কী, দৃষ্টিভঙ্গি কী- এই বিষয়গুলো সহজ-সরলভাবে তাঁদের নিকট থেকে গ্রহণ করতে হবে। যখন হৃদয় প্রস্তুত হবে, দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠিত হবে তখন সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন করতে পারবেন এবং আল্লাহ চাহে তো সঠিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করবেন। তখন ঈমানের স্বাদ অনুভব করবেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন। এই বোধ ও উপলব্ধি যেমন আপনার অন্তরকে শীতল করে দিবে তেমনি আপনার চোখ থেকে অশ্রু ঝরাবে; এ অশ্রু আনন্দের। এ অশ্রু প্রাপ্তির। কিন্তু এখন তো অবস্থা হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কে পশ্চিমা চিন্তা-ধারা, আমাদের দৃষ্টিতে পশ্চিমের চশমা, আমাদের হৃদয়ে শিকড় গেড়ে বসে আছে ভোগবাদ ও বস্তুবাদ। আমাদের স্বভাব-চরিত্রে অহং ও ঔদ্ধত্য। এইসব আগাছায় আকীর্ণ চিন্তা ও হৃদয়, স্বভাব ও চরিত্র নিয়ে যখন কেউ কুরআন-সুন্নাহর তরজমা পড়ছি, কুরআনের বাণী ও বিধান পাঠ করছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহ পাঠ করছি তখন এর সঠিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছি না। আমরা শব্দ পড়ছি কুরআনের, কিন্তু অর্থ গ্রহণ করছি ঐটা, যেটা আমার চিন্তা ও দর্শনের অনুকূল। বস্তুবাদ ও ভোগবাদের অনুকূল। পশ্চিমা দর্শনের আলোকে আমরা কুরআন-সুন্নাহর ব্যখ্যা পেতে চাইছি। কুরআন-সুন্নাহর দ্বারা ঐ সকল দর্শনের অসারতা উপলব্ধি করতে পারছি না। কাজেই প্রথম প্রয়োজন, চিন্তা ও হৃদয়কে আগাছামুক্ত করা। তাহলেই মুক্তমনে উন্মুক্ত হৃদয়ে কুরআন-সুন্নাহর বাণী শ্রবণ করা সম্ভব হবে। এটা হবে ঐ শ্রবণ, যা চিন্তাকে আলোকিত করে এবং হৃদয়কে আন্দোলিত করে। ঐ শ্রবণ, যা ফিক্হ ও প্রজ্ঞা দান করে এবং জীবনে বিপ্লব সাধন করে। তো কুরআন-সুন্নাহ থেকে আলো গ্রহণের স্বাভাবিক পন্থা হল, কুরআন-সুন্নাহর ধারক-বাহকদের সাহচর্য অবলম্বন করা। তাদের সাহচর্যের দ্বারা নিজের চিন্তা ও মস্তিষ্ককে প্রস্তুত করা। চিন্তা ও মস্তিষ্ক থেকে বাইরের উপাদানগুলো বের করা। এরপর যখন কুরআন পড়ব, সুন্নাহ পড়ব তখন কুরআন-সুন্নাহর সঠিক অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। তখন আল্লাহ চাহে তো আমাদের ক্ষেত্রেও সত্য হবে فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانا হ্যাঁ, তাদের হয়েছিল তাদের শান অনুসারে, আমাদের হবে আমাদের অবস্থা অনুসারে। কিন্তু হবে যে- এতে কোনো সন্দেহ নেই। যাই হোক, এটি একটি প্রাসঙ্গিক কথা ছিল, যে কথাটি বলতে চাচ্ছি তা হল, আল্লাহ তাআলা কিতাব পাঠিয়েছেন। শুধু কিতাব পাঠাননি কিতাবের সাথে সেই কিতাবের আমলী নমুনাও পাঠিয়েছেন। সেই আমলী নমুনা হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।(আল কাউসার- বর্ষ,১৩ সংখ্যা১১)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমার অনুসরণ

করো। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের
পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল। পরমদয়ালু।”
[সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১]

সাহাবিদের জীবনে তাকালে দেখা যাবে, তাঁরা সুন্নাহ মেনে চলার ব্যাপারে ছিলেন খুবই সতর্ক। যতভাবে রাসূল(সা) -এর সুন্নাহকে মেনে চলা যায়, ততভাবেই তাঁরা মানার চেষ্টা করেছেন। আনাস একদিন রাসূল(সা) -কে তরকারির মধ্যে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে খেতে দেখেছিলেন। ব্যস, এতটুকু দেখেই তিনি নিজের জন্য লাউ পছন্দ করিয়ে নিয়েছিলেন। অথচ না কখনো রাসূল (সা) তাঁকে লাউ খাবার নির্দেশ দিয়েছেন, না এর কোনো ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

ভ্রমণের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উমার(রা) মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী স্থানে যেতেন এবং দুপুরবেলা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। কারণ, তিনি রাসূল (সা) -কে একই জায়গায় একইভাবে বিশ্রাম নিতে দেখেছেন। একদিন ভ্রমণের সময় রাসূল (সা) প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে এক জায়গায় থেমেছিলেন। সফরে বের হলে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) -ও সে জায়গায় থেমে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন। কুররা ইবনে ইয়াস (রা) যখন রাসূল (সা) -এর হাতে বাইয়াত নিতে এসেছিলেন, তখন তিনি লক্ষ করলেন রাসূল (সা) -এর জামার বোতাম খোলা রয়েছে। এ জন্য শীতে কিংবা গরমে কখনো তিনি জামার বোতাম লাগাতেন না।

আমরা হয়তো এই উদাহারণগুলো কট্টরতা ভাবতে পারি। তবে তাঁরা এগুলো করতেন রাসূল (সা) -এর প্রতি ভালোবাসা থেকে। তাই তো দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট, তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। নি:সন্দেহে পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছেন, তাদের মধ্যে রাসূল (সা) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর তাঁর দৃষ্টান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা যদি তাঁকে ভালোবেসে সে সুন্নাহগুলোর অনুসরণ করি,তবে আল্লাহ তা ‘আলাও আমাদের ভালোবাসবেন

রাসূল (সা) আমাদের সুন্নাহ অনুসরণ করতে বলেছেন। অবহেলা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘তোমরা অবশ্যই আমার এবং আমার পরে খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ মেনে চলবে। এগুলো মেনে চলবে এবং শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর (ধর্মের ব্যাপারে) সকল নতুন উদ্ভাবিত বিষয়ে সাবধান। কেননা, সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় হচ্ছে বিদআত। আর সকল বিদআত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা।(হাদিসটি আবু দাউদ (৪৬০৭) উল্লেখ করেছেন এবং আলবানী (র) একে সহীহ বলেছেন তার সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে)

আল্লাহর রাসূলের (সা.) পরেই যাঁরা কুরআনের সত্যিকারের অর্থ সবচেয়ে ভাল বুঝতেন এবং একজন বিশ্বাসীর কি ধরণের আচরণ করা উচিত তা সবচেয়ে ভাল যাঁরা জানতেন, তাঁরা

হচ্ছেন সাহাবা রাদিআল্লাহু আনহুম । আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেই তাঁর প্রজন্মকে সর্বশ্রেষ্ট প্রজন্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন: "তোমাদের (আমার উম্মতের) মাঝে সর্বশ্রেষ্ট হচ্ছে আমার প্রজন্ম, তারপর হচ্ছে তার পরের প্রজন্ম, এবং তারপর হচ্ছে তার পরের প্রজন্ম।" [সহীহ বুখারীঃ ৬০৬৫; সহীহ মুসলিমঃ ২৫৩৩] । বাস্তবিকই সাহাবীদের (রা.) মাধ্যমে আল্লাহ কুরআনকে সংরক্ষিত করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্মগুলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তারিত দিকগুলো সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। নীচে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও জ্ঞানী সাহাবীদের কয়েকজনের মতামত এবং রাসূল (সা.)-এঁর সুন্নাহ সম্বন্ধে তাঁদের অবস্থান তুলে ধরা হল ।

সুন্নাহ সম্বন্ধে সাহাবীদের কিছু বক্তব্য উল্লেখ করার আগে, তাঁদের আচরণের একটা ব্যাপার সম্পর্কে উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে; তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ট ঐ প্রজন্ম যাঁরা নবী (সা.)-কে তাৎক্ষিণকভাবে অনুসরণ করেছেন – কোন একটা নির্দিষ্ট কর্ম রাসূল (সা.) কেন সম্পাদন করলেন, সে সম্বন্ধে কোন সংশয় বা প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়াই । উদাহরণস্বরূপ বুখারীর বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)-এঁর সূত্রে জানা যায় যে, 'রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি সোনার আংটি পরতেন, আর তাই লোকেরাও সোনার আংটি পরতে শুরু করলো । তারপর নবী (সা.) আংটিটি পরিত্যাগ করলেন এবং বললেন, "আমি আর কখনো এটা পরবো না ।" লোকেরাও সাথে সাথে তাদের সোনার আংটিগুলি পরিত্যাগ করলো। [সহীহ বুখারী; অধ্যায়ঃ৭২/পোষাক-পরিচ্ছদ; হাদীস নংঃ ৭৫৬]

আরেকটি উপলক্ষে নবী (সা.) সালাত আদায় করছিলেন এবং সালাতের মাঝে তিনি তাঁর জুতা খুলে ফেললেন। সাহাবীরা (রা.) যখন তাঁকে ঐরকম করতে দেখলেন, তখন তাঁরা নিজেরাও তা অনুসরণ করলেন । পরবর্তীতে তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁরা কেন তাদের জুতা খুলে ফেলে দিলেন । তাঁরা বললেন, "কেননা আমরা আপনাকে আপনার জুতো খুলে ফেলতে দেখেছি ।" তিনি তাঁদের ব্যাখ্যা করলেন, "জিবরাইল (আ.) আমাকে জানিয়েছিলেন যে, আমার জুতোয় কিছু ময়লা লেগেছিল।" [আবু-দাঊদঃ ৬৫০, শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

সাহাবীদের এই আচরণ এবং এর বাস্তবতা এই যে, তাঁদের এহেন আচরণের জন্য আল্লাহ এবং রাসূল (সা.) কখনোই তাদের তিরস্কার করেননি অথবা ভুল শুধরে দেননি – এটা হচ্ছে সুন্নাহ মর্যাদার ব্যাপারে আরেকটি প্রমাণ । এ ধরনের ব্যাপার: 'আল্লাহর নীরব অনুমোদন' – এই শ্রেণীভূক্ত হবে । এটা অকল্পণীয় যে তাঁরা যদি ভুল করে থাকতেন, তাহলে আল্লাহ

তাঁর তরফ থেকে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত ছাড়া তাঁদের সে আচরণ অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যেতে দেবেন ।

আল্লাহর রাসূলের জীবিত অবস্থায় তাঁদের উপরোক্ত ধরনের কর্মকান্ড ছাড়াও সাহাবীরা সুন্নাহর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে পরবর্তীতে তাঁদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদান করে গেছেন এমন বহু উদ্ধৃতির মাঝে নীচের উদ্ধৃতিগুলোও রয়েছে:

১) সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, "যারা উল্কি আঁকে, যারা উল্কি আঁকাতে চায়, যারা ভ্রু তুলে সরু করে এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটাতে দাঁত ফাঁক করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ।" একথা উম্ম ইয়াকুবের কাছে পৌঁছালে তিনি তাঁর কাছে আসেন এবং বলেন, "আমি শুনেছি আপনি এমন এমন কথা বলেছেন ।" তিনি তাঁকে বললেন, "আল্লাহর রাসূল (সা.) যেটাকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং যা আল্লাহর কিতাবে পাওয়া যায় সেরকম ব্যাপারে যদি আমি অভিশাপ দিই তাহলে আমার দোষ কোথায় মহিলা তাঁকে বললেন, "আমি (আল্লাহর কিতাব) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছি, কিন্তু কোথাও (আপনি যা বলেছেন) তা পাইনি ।" আব্দুল্লাহ্ (রা.) তাঁকে বললেন, "আপনি পড়ে থাকলে তো আপনার পাবার কথা । আপনি কি পড়েন নি 'আল্লাহর রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করে তা থেকে দূরে থাকো' ?" [সূরা হাশর,৫৯;৭] মহিলা বললেন, "হ্যাঁ" তিনি বললেন, "তিনি [আল্লাহর রাসূল (সা.)] এসব জিনিস নিষেধ করেছেন।" [সহীহ বুখারীঃ ৪৬০৪; সহীহ মুসলিমঃ ২১২৫]

এই ঘটনায় একজন সাহাবী নবীর (সা.) প্রদত্ত বিধিনিষেধকে আল্লাহর বিধিনিষেধ বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ ভদ্রমহিলা, অর্থাৎ, উম্ম ইয়াকুব, আব্দুল্লাহ্কে (রা.) ভুল বুঝেছিলেন, এবং ভেবেছিলেন যে, তিনি এমন কোন সুনিদিষ্ট আয়াতের কথা বলেছেন যেখানে ঐ কাজগুলির কথা নিদিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা রয়েছে । আব্দুল্লাহ (রা.) তাঁর ব্যাখ্যায় দেখান যে, আল্লাহর রাসূল (সা.) যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা আসলে আল্লাহ যা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছেন তার মতই গুরুত্বপূর্ণ । এ ব্যাপারে তাঁর প্রমাণ ছিল সূরা হাশরের সাত নম্বর আয়াত ।

২) সাঈদ ইবন আল-মুসাইয়্যেব থেকে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে যে, উমর (রা.) বলেন, "একজন বিধবা তার স্বামী হত্যার বিপরীতে প্রাপ্ত রক্তপণ থেকে উত্তরাধিকার হিসাবে কিছুই পাবে না।" আদ-দুহাক ইবন সুফিয়ান, উমর (রা.) কে বলেন যে, "রাসূল(সা.) একবার

তাঁকে লিখেছিলেন যে, আস-শিয়াম আল-যাহাবীর স্ত্রীকে যেন তার স্বামীর রক্তপণের একটা অংশ উত্তরাধিকার হিসাবে দেওয়া হয় ।" উমর (রা.) তারপর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন । এবং রক্তপণের একটা অংশ বিধবাকে দান করেন।" [সুনানে আবু-দাঊদ; খন্ড ১২, হাদীস নং ২৯২১] এই ঘটনা থেকে উমর আল-খাত্তাব (রা.) সুন্নাহর প্রতি কেমন মনোভাব পোষণ করতেন, তা বোঝা যায় – যিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন এবং দ্বীনের জ্ঞান ও সঠিক ধারণার জন্য যাঁর সুখ্যাতি ছিল । না জেনে তিনি এমন একটা অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন, যেটা রাসূল (সা.)-এঁর সিদ্ধান্তের বিপরীত । কিন্তু যখনি তিনি বুঝলেন যে, তাঁর সিদ্ধান্ত সুন্নাহর বিপরীতে চলে যাচ্ছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর মতামত পরিত্যাগ করলেন এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের (সা.) সিদ্ধান্তের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমপর্ণ করলেন ।

আরেকটি ঘটনায় যেখানে উমর (রা.) সম্পৃক্ত ছিলেন, একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল কেননা একজন সাহাবী একটা সদৃশ ঘটনার ব্যাপারে নবী (সা.)-এঁর একটা হাদীস বর্ণনা করেছিলেন । তারপর উমর (রা.) বলেছিলেন, "আমরা যদি এই হাদীস না শুনতাম, তবে আমরা একটা ভিন্ন সিদ্ধান্ত দিতাম । আমরা আমাদের মতামত অনুযায়ী বিচার করতাম ।" এখানেও ইমাম শাফি' ঈ যেমন মন্তব্য করেন – উমরের (রা.) সিদ্ধান্ত নবীর (সা.) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হতো না । কিন্তু যখন তাঁকে নবীর (সা.) সিদ্ধান্ত জানানো হলো, উমর (রা.) জানলেন যে, এ ব্যাপারে তাঁর আর কিছুই বলার রইলো না এবং উপরন্তু তিনি জানাতেন যে, একজন বিশ্বাসীকে অবশ্যই নবীর (সা.) সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে, এমনকি তা যদি তাঁর নিজের মতের বিপক্ষেও যায় ।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের আরেকটি বর্ণনায় একটি ঘটনার কথা উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে উমর (রা.) আল-শামে (বৃহত্তর সিরিয়া) যাবার জন্য মনস্থির করেছিলেন, সেখানে তখন একটা মহামারির প্রকোপ দেখা দিয়েছিল । এমতাবস্থায় তাঁর সাথে আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.)-এঁর দেখা হলো, তখন আব্দুর রহমান (রা.) তাঁকে বললেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, "যদি তোমরা শোন যে, কোন নিদিষ্ট স্থানে মহামারী দেখা দিয়েছে তবে, সে স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করো না; এবং তুমি যদি সেই স্থানে আগে থেকেই অবস্থান করে থাকো, তবে সেই স্থান ত্যাগ করে বাইরে যেও না।" [সহীহ বুখারীঃ ৫৭৩৯; সহীহ মুসলিমঃ ২২১৯] এটা শুনে উমর (রা.) বুঝলেন যে, তাঁর জন্য আল-শামের দিকে যাওয়াটা সঠিক হবে না, তাই তিনি মদীনায় ফিরে এলেন ।

বুখারীতে লিপিবদ্ধ আরেকটি ঘটনায় দেখা যায় যে, ওমর (রা.) মাজুসিদের কাছ থেকে জিযিয়া কর সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকেন যতক্ষণ না আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রা.) সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নবী (সা.) তাঁদের কাছ থেকে ঐ কর সংগ্রহ করেছিলেন । [সহীহ বুখারীঃ ৩১৫৭] এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, এমনকি রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নবীর(সা.) আদেশ ও সুন্নাহর কাছে সমর্পিত । মাজুসীদের কাছ থেকে জিযিয়া কর গ্রহণ করার ব্যাপারে সংশয় থাকার দরুণ [যতক্ষণ না তিনি এ ব্যাপারে নবীর(সা.) উদাহরণ সম্পর্কে জানতে পারেন, ততক্ষণ], উমর (রা.) বর্ধিষ্ণু ইসলামী রাষ্ট্রের বাজেটের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছিলেন ।

৩) আল- বাইহাকী ও আল-হাকিম কর্তৃক লিপিবদ্ধ সহীহ সনদে দেখা যায় যে, তাউস আসরের ফরজ সালাতের পরে ২ রাকাত নফল সালাত পড়ছিলেন । ইবন আব্বাস (রা.) তাঁকে তা থেকে বিরত থাকতে বললেন । তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি তা ত্যাগ করবেন না । ইবন আব্বাস (রা.) তখন তাঁকে বললেন, "আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আসরের সালাতের পরে সালাত নিষিদ্ধ করেছেন [মাগরেবের আগ পর্যন্ত] সুতরাং, আমি জানিনা (তুমি যে সালাত আদায় করেছো তার জন্য) তুমি শাস্তি পাবে না পুরস্কৃত হবে । [বাইহাকী ৪৪০৪] নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বলেছেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে আদেশ দিলে, কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না । কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" [সূরা আল-আহাযাব,৩৩:৩৬]

এই ঘটনা থেকে যে কেউ নবীর আদেশের গুরুত্বটা সহজেই বুঝতে পারবেন । ইবাদতের মত একটা সৎকর্মের বেলায়ও যে কারো মনে রাখতে হবে যে, সে সম্বন্ধে নবী (সা.) প্রদত্ত নিয়ম-নীতি কী । ইবন আব্বাস (রা.) তাউস-কে বললেন, "আমি জানি না তুমি পুরস্কৃত হবে না শাস্তি লাভ করবে" – তাউস যে অতিরিক্ত সালাত আদায় করার জন্য শাস্তি লাভ করবেন তা কিভাবে হয়? তা এজন্যই যে, তিনি আসলে নবীর আদেশ অমান্য করছিলেন! এ থেকে বোঝা যায়, সকল সৎকর্ম – তা যতই উন্নতমানের হোক না কেন – গ্রহণযোগ্য হবার জন্য সেগুলোকে অবশ্যই কুর' আন ও সুন্নাহ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে ।

4) আব্দুল্লাহ্‌ ইবন ওমর (রা.), রাসূল (সা.) থেকে বর্ণণা করেন যে, তিনি বলেন, "তোমাদের মেয়েদের রাতে মসজিদে যেতে দিও ।" আব্দুল্লাহর (রা.) একজন ছেলে বললেন যে, তিনি তা করবেন না । এটা আব্দুল্লাহ (রা.) তাঁর ছেলেকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন, তার বুকে ধাক্কা দিলেন এবং বললেন, "আমি আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটা হাদীস তোমাকে বললাম, আর তুমি বলছো 'না'।" [জামে তিরমিজী ৭০৯/১; বুখারী ৩০৫/১] এই ঘটনায়

আব্দুল্লাহ্ ইবন ওমর (রা.), যিনি সাহাবীদের মাঝে সবচেয়ে জ্ঞানীদের একজন ছিলেন, তিনি তাঁর ছেলের বুকে এইজন্য আঘাত করেছিলেন যে, তাঁর ছেলে নবীর (সা.) একটা আদেশ না মানার প্রবণতা দেখিয়েছিলেন । আব্দুল্লাহর (রা.) বক্তব্য থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, তিনি এমন একটা কিছু বলছিলেন: "আমি তোমাকে নবীর (সা.) একটা বক্তব্য শোনাচ্ছি, আর তুমি ভাবছো যে, তারপরও এ ব্যাপারে তোমার নিজস্ব কোন বক্তব্য রয়েছে । নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে তোমার আর নিজস্ব কোন বক্তব্য থাকতে পারে না ।" [আল মাজমু' আল কাবির ৩৬২/১২]

৫) কাতাদাহ বর্ণনা করেন, "আমরা ইমরান ইবন হুসায়েন ও বুশায়ের ইবন কাব এ সাথে বসেছিলাম । ইমরান বর্ণনা করেন যে, 'শালীনতাবোধ হচেছ একটি পরিপূর্ণ গুণ' অথবা তিনি বলছিলেন 'শালীনতাবোধ পুরোটাই ভাল ।' এটা শুনে বুশায়ের ইবন কাব বলেন `আমরা নিদিষ্ট কিছু বইয়ে অথবা জ্ঞানের বইয়ে দেখতে পাই যে, এটা হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত মনের প্রশান্তি অথবা আল্লাহর খাতিরে ভদ্র আচরণ এবং এর কিছু দুর্বল দিকও রয়েছে ।' ইমরান এতই রাগান্বিত হলেন যে, তাঁর চক্ষু লাল হয়ে উঠল এবং তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূলের (সা.) একটি হাদীস বর্ণনা করছি আর তুমি তার বিরোধিতা করছো।" [সহীহ আল বুখারী ৫৭৬৬, সহীহ মুসলিম ৩৭]

আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী তাঁর সহীহ মুসলিমের অনুবাদ ও ব্যাখায় এই হাদীসের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:"এই হাদীস একজন নবীর মর্যাদা ব্যাখ্যা করে । নবীদের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে ঐশ্বরিক । আর তাই তা নিখুঁত এবং সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত। মানুষের প্রজ্ঞা মূলত পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও মতামতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে । আর তাই তা কখনোই নির্ভুল হতে পারে না । এ কারণেই মানবজাতিকে সবসময়ই নবীদের আদেশ মানার তাগিদ দেয়া হয়েছে – দার্শনিকদের নয় । এ হাদীস স্পষ্টতই আমাদের হাদীসের মর্যাদা সম্বন্ধেও জ্ঞান দান করে । এটা হচেছ ঐশ্বরিক জ্ঞানের অংশবিশেষ । আর তাই ধর্মীয় অনুভূতি সহকারে এটাকে গ্রহণ করা উচিত।"

এ হাদীসে বুশায়ের আরবদের কিছু প্রাচীন পুস্তকের কথা উল্লেখ করছিলেন যেগুলোতে তাদের 'প্রজ্ঞা ' লিপিবদ্ধ ছিল । কিন্তু তা যখন সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তার বিরোধিতা করে তখন সেটাকে কি করে 'প্রজ্ঞা ' বলা যায় ? রাসূল (সা.) যখন বললেন যে, এর উল্টোটাই করা সত্যি তখন সেটাকে আর কি করে 'প্রজ্ঞা' বলে বিবেচনা করা যায়? নবী (সা.) যখন কোন বিষয়ে কথা বলেছেন তখন সেই বিষয়ে নবীর (সা.) বক্তব্য বিরোধী কোন বক্তব্যকে কেউ কিভাবে সম্মান দেখাতে পারে? [দুভার্গ্যজনকভাবে যে কেউ এমন অনেক মুসলিম খুঁজে পাবেন যারা এমন সব ধ্যান-ধারণা অনুসরণ করেন, যা বিশেষত স্বল্লোন্নত দেশের কারো কারো জন্য, 'বিজ্ঞান সমৃদ্ধ পশ্চিম' থেকে আসা যে কোন কিছুই তাদের নিজেদের 'ঐতিহ্যবাহী প্রজ্ঞার' চেয়ে উন্নততর বলে মনে হয় । এটা হয়তো একধরণের

হীনমন্যতা থেকে উদ্ভূত । অথচ একজন মুসলিম যে কিনা কেবল আল্লাহর ইবাদত করে এবং তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তার উচিত নয় এমন কেউ বা এমন কোন সভ্যতা যা কিনা আল্লাহর হেদায়েত বিবর্জিত – তার মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়ে হীনমন্যতায় ভোগা ।]

আসলে এধরণের আরো বহু উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে কেউ নবীর একটি হাদীস অস্বীকার করাতে অথবা সে সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য করাতে তার সাথে কেউ কথা বলতে অস্বীকার করেছে । সুন্নাহর স্বপক্ষে অবস্থান করতে গিয়ে এ ধরণের আচরণের কথা আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফাল, ইবাদা ইবন আল সামতি, আবু আদ দারদা এবং আবু সাঈদ আল-খুদরীর মতো সাহাবীদের বর্ণনায় জানতে পারি । পরবর্তী আলেমদের কাছ থেকেও একই ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায় । এসব দুর্ব্যবহার কেবল একভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়: **নবীর (সা.) কোন বক্তব্য কোন মুসলিম বিরোধিতা করবেন অথবা প্রত্যাখ্যান করবেন – এটা অকল্পণীয়** ।ওরকম ব্যবহারের কোন অবকাশ নেই, আর তাই পাপকার্যের জঘন্যতা অনুযায়ী তার প্রতিক্রিয়া সেরকম ছিল ।

৬) সাঈদ বিন আল-মুসাইয়্যেব বর্ণণা করেন, "আলী (রা.) ও উসমান (রা.) মক্কা ও মদীনার যাত্রাপথের মাঝখানে ছিলেন । সময়টা ছিল এমন যখন উসমান (রা.) কোন নিদিষ্ট কারণবশত লোকজনকে তামাত্তু সম্পাদন থেকে বিরত রাখছিলেন (অর্থাৎ একই নিয়তে মাঝখানে একটি বিরতি দিয়ে, হজ্জ এবং ওমরাহকে একই যাত্রায় সম্পাদন করা)। আলী (রা.) নিয়ত করলেন: "আমরা মাঝখানে একটি বিরতি সহ হজ্জ এবং ওমরাহর জন্য আসছি ।" উসমান (রা.) তাঁকে বললেন, "তুমি দেখছো যে, আমি লোকজনকে এটা করা থেকে বিরত রাখছি অথচ তুমি তাই করছো?" আলী (রা.) তাঁকে উত্তর দিলেন, "আমি মানবজাতির কারো বক্তব্যে আল্লাহর রাসূলের (সা.) সুন্নাহ পরিত্যাগ করতে পারি না।" [সহীহ মুসলি্ অধ্যায়ঃ হজ্জ্ব, হাদীস নং ২৮১৬] এই ঘটনা থেকে আবারও দেখা যায় যে, নবীর (সা.) সাহাবীরা আল্লাহ অথবা তাঁর রাসূলের (সা.) কর্তৃত্ব ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব মেনে নিতেন না । এই ঘটনায় আলী (রা.) দেখছিলেন যে, উসমানের (রা.) ফিকহী যুক্তিতে ভুল ছিল । কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, উসমান (রা.) তামাত্তু সংক্রান্ত সুন্নাহকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি । এখানে মনে রাখা উচিত যে, এই ঘটনার সময় উসমান (রা.) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন । এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সাহাবীরা জানতেন যে ইসলামের ভূমিতে সর্বোচচ কর্তৃত্বের অধিকা্রী ব্যাক্তিও, তা তিনি যতই পরহেজগার হন না কেন, তিনিও এমন কোন আইন চাপিয়ে দিতে পারি না যা নবীর (সা.) সুন্নাহর বিপক্ষে যায় ।

সাহাবীদের সম্বন্ধে অনেক কয়টি বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের কাছে যে বর্ণনা এসেছে তাতে দেখা যায় যে, কোন সমস্যা দেখা দিলে তাঁরা প্রথমে আল্লাহর কিতাবে তার সমাধান খুঁজতেন । সেখানে সমাধান না পেলে তখন তাঁরা নবী (সা.)-এঁর সুন্নাহয় তার সমাধান খুঁজতেন ।

সেখানেও কোন সমাধান না পেলে তখন তাঁরা ব্যক্তিগত যুক্তির সাহায্য নিতেন । এটি প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এবং তাঁর উত্তরসূরী ওমর (রা.) – তাদের পন্থা এবং আসলে সকল সাহাবীদের পন্থাই ছিল এটা ।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি:

ক) (দ্বীনের জ্ঞানের ব্যাপারে যাঁরা সর্বোত্তম ও সবচেয়ে জ্ঞানী ছিলেন সেই প্রজন্ম অর্থাৎ) সাহাবীদের মাঝে এই ব্যাপারে একটা ঐকমত্য ছিল যে, নবীর (সা.) সুন্নাহ অনুসরণ করাটা তাঁদের জন্য অবশ্য করণীয় ছিল । এবং তাঁদের কেউই নিজেকে এই বাধ্যবাধকতার উর্দ্ধে বলে কখনও দাবী করেন নি ।

খ) নবীর (সা.) মৃত্যুর পরে মুসলিমরা তখনও একমত ছিলেন যে, তাঁদের অবশ্যই নবীর (সা.) সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে ।

গ) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে – ইবাদত থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা – সব ক্ষেত্রেই নবীর (সা.) সুন্নাহকে প্রয়োগ করতে হবে এবং এমনকি রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তাঁরও নবীর (সা.) সুন্নাহর বিপরীতে শাসনকার্য পরিচালনা করার অধিকার নেই । [সুন্নাহ সম্পর্কে সাহাবীদের দৃষ্টিভঙ্গী- জামাল আদ-দ্বীন জারাবোজো https://quraneralo.com/]

সালাফ ও সালফে সালেহিন যেভাবে সুন্নাহ আকড়ে ধরেছিলেন

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **«خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ».**

[صحيح] - [متفق عليه] - [صحيح البخاري: 2651]

ইমরান ইবনু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“আমার উম্মাতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ আমার যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ।” (বর্ণনাকারী) ‘ইমরান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তিনি তাঁর যুগের পর দু’যুগ অথবা তিন যুগ বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “অতঃপর এমন লোকের আগমন ঘটবে যাদের বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তাদেরকে কেউ বিশ্বাস করবে না, যারা সাক্ষ্য প্রদানে আগ্রহী হবে; অথচ তাদের নিকট সাক্ষ্য চাওয়া হবে না, তারা মান্নত

করবে; কিন্তু তা পূরণ করবে না, তারা হবে চর্বিওয়ালা মোটাসোটা।(১)" **[সহীহ]** - [মুত্তাফাকুন 'আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।] - [সহীহ বুখারী - 2651]

সালফে সালেহিন অর্থ পুণ্যবান পূর্বসূরি। সালফে সালেহিন বা সালাফ বলা হয়, পূর্ববর্তী এমন মুসলিম ব্যক্তিত্বদের, যারা নবী কারিম (সা.)-এর নির্দেশিত পন্থা আমৃত্যু অনুসরণ করেছেন। যাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতের 'শ্রেষ্ঠ মানুষ' হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছেন। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে- خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ হলো- আমার যুগের মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ। (বুখারি: ৬৬৫৮)

সালফে সালেহিনের যুগ বলতে সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনদের যুগকে বলা হয়। ওই যুগের মুসলমানরা সব বিষয়ে সব ক্ষেত্রে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রিয়নবী (সা.)-এর অনুসরণ করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের বিদায়ের পরই শুরু হল তাবেঈনদের যুগ। তাবেঈদের যুগের শুরুতেই প্রকাশ পেল ইসলামের নামে নানা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। এ ষড়যন্ত্র মূলত: সাহাবীদের পরেই নয় বরং তা শুরু হয়েছে আরও আগেই। ইসলামের শত্রুরা যখন প্রকাশ্য মুকাবিলায় ব্যর্থতার শিকার হল, তখন শুরু হল সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত। এটা মূলত: দ্বিতীয় খলীফা আমীরুল মুমিনিন ওমার রাদিআল্লাহু আনহু-কে মাজুসী/অগ্নিপূজক এর মাধ্যমে হত্যার মধ্য দিয়েই শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ খলীফার ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। একে একে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একনিষ্ঠ সহচর বা সাহাবীদের বিদায়ের পাশাপাশি ইসলাম আগ্রাসী অপশক্তির ছোবলের তেজ আরও প্রখর হতে লাগল। খাওয়ারেজ, রাফেযী, মুরজিয়া ও কাদেরীয়া ইত্যাদি ফেৎনার মুখোস উন্মোচন হল। ইসলামী বিষয়াদীতে সংশয়-সন্দেহ অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। এমতাবস্থায় সুন্নাহ সংরক্ষণ একটি জরুরী ও জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়াল। এ সন্ধিক্ষণে তাবেঈগণ নানাভাবে সুন্নাহ সংরক্ষণ ও সংগ্রহ করে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। সুন্নাহ সংরক্ষণে তাঁদের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ :

১. العناية بحفظها হাদিস মুখস্থ করণে গুরুত্ব প্রদান।

২. السوال عن الاسناد হাদিসের সনদ/ সূত্রের সঠিকটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ, অর্থাৎ সনদ যাচাই করণ।

৩البحث في أحوال الرجال ونقلة الأخبار হাদিস বর্ণনাকারী/রাবীদের জীবন-চরিত সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্লেষণ।

৪.تدوين السنة الذي بدأ بصحف وأجزاء ثم تطور বিভিন্ন পুস্তিকা ও খণ্ড খণ্ড গ্রন্থে হাদিস সংকলন, যাহা পরবর্তীতে বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্ত্বা ইত্যাদি সংকলনে রূপলাভ করে।

সাহাবীদের শেষ লগ্নে তাবেঈদের যুগে বিদ‘আত, খোরাফাত ইত্যাদির বিকাশ ঘটলে সরলভাবে হাদিস গ্রহণ করা হত না, বরং পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করে ছিকাহ অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত রাবী/বর্ণনাকারীর হাদিসই শুধু গ্রহণ করা হত। কারণ এ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنْ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ

“সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, শেষ যুগে কতক মিথ্যুক দজ্জালের আগমন ঘটবে, তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদিস পেশ করবে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও কখন শোনেনি, অতএব তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও, তারা যেন তোমাদেরকে পথভ্রষ্টটা ও ফিতনা-ফ্যাসাদে নিপতিত করতে না পারে।[মুসলিম: ৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সতর্ক বাণীর আলোকে সাহাবীদের শেষ যুগে এবং তাবেঈদের যুগে হাদিস গ্রহণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম শুনলেই যথেষ্ট মনে করা হত না, বরং খুবই সতর্কতার সাথে যাচাই-বাছাই করে হাদিস গ্রহণ করা হত। ইমাম মুসলিম [রাহিমাহুল্লাহ] সাহাবী ও তাবেঈদের হাদিস গ্রহণের অবস্থাসমূহ স্বীয় গ্রন্থ সহীহ মুসলিমের ভূমিকায় সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল:

[১] ইমাম মুসলিম [রাহিমাহুল্লাহ] স্বীয় সনদে প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুজাহিদ [রাহিমাহুল্লাহ] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: বাশীর বিন কা’ব আল আদাবী সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-এর কাছে আসলেন এবং হাদিস বর্ণনা শুরু করলেন, বলতে লাগলেন: قَالَ رَسُولُ اللهِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইত্যাদি” কিন্তু সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু তাকে হাদিস বর্ণনার কোন সুযোগ দিলেন না। এমনকি তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। বাশীর বিন কা’ব বললেন, হে ইবনু আব্বাস! কি ব্যাপার, আপনি আমার হাদিস শুনছেন না কেন? আমি আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদিস বর্ণনা করছি, আর আপনি কোন কর্ণপাত করছেন না? তার জবাবে ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, প্রথম পর্যায়ে কোন ব্যক্তিকে যখনই বলতে শুনতাম যে, قَالَ رَسُولُ اللهِ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- সাথে সাথে তার কথায় আমরা মনোযোগী হতাম এবং খুব গুরুত্ব দিয়ে তার কথা শুনতাম, কিন্তু যখন মানুষ বিভিন্ন ছলচাতুরী শুরু করল, তখন হতে আমাদের জানা বিষয় ছাড়া সাধারণ মানুষ হতে অন্য কিছু শুনি না এবং গ্রহণ করি না”।

এ বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস গ্রহণে তাঁরা কত সতর্ক ছিলেন। সাহাবী ছাড়া অন্য কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে বর্ণনা করলেও নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে হাদিস গ্রহণ করতেন না।

[২] প্রসিদ্ধ তাবেঈ মুহাম্মদ বিন সীরিন [রাহিমাহুল্লাহ] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ "নিশ্চয় হাদিসের জ্ঞান হল দ্বীনের অন্যতম অংশ, অতএব ভালভাবে লক্ষ কর তোমরা কাদের হতে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ"।

[৩] তিনি আরও বলেন, "হাদিসের সনদ/সূত্র ও রাবী বা বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হত না, কিন্তু যখন হতে [কাদেরীয়া, মুরজিয়া, জাবারিয়া ও রাফেযী ইত্যাদি বিদ'আতের] ফিতনা প্রকাশ পেল তখন হতে জিজ্ঞাসা শুরু হল: سموا لنا رجالكم... "যাদের বরাতে হাদিস বর্ণনা করছ তাদের নাম উল্লেখ কর", ব্যক্তিরা যদি সুন্নাতপন্থী হতেন তাহলে তাদের হাদিস গ্রহণ করা হত, আর যদি বিদ'আতী হতেন তাহলে তাদের হাদিস প্রত্যাখ্যান করা হত"।

[৪] আব্দান বিন উছমান মারওয়াযী [রাহিমাহুল্লাহ] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন: আব্দুল্লাহ বিন মুবারককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: اَلإِسْنَادُ مِنْ الدِّينِ لَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ "হাদিসের সনদ/সূত্র দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ যদি এ সনদ বর্ণনার ব্যবস্থা না থাকত তাহলে যার যা ইচ্ছা হত তাই বলত"।

তাবেঈদের হাদিস সংগ্রহে এবং সংরক্ষণে এ নীতি অবলম্বন বিদাতী চক্রের ষড়যন্ত্র এবং ইসলামের শত্রুদের সুদূর পরিকল্পিত চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যায়। হাদিসের নাম দিয়ে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বরাতে মিথ্যাচারের পথে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে সনদ বিহীন বর্ণনার সুযোগ ও মিথ্যুক দজ্জালদের দাজ্জালি ও মিথ্যাচার বন্দ হয়ে যায়, বা চালু থাকলেও পরিশেষে মিথ্যা প্রকাশ পেয়ে যায়।

তাবেঈদের এ নীতি অবলম্বন করে সর্বপ্রথম হাদিস শাস্ত্রের নীতিমালা প্রণয়ন করেন ইমাম শাফেয়ী [রাহিমাহুল্লাহ] তাঁর "আর রিসালাহ" ও "কিতাবুল উম্ম" গ্রন্থদ্বয়ে। এরপর এ শাস্ত্রের গভীর সমুদ্রে পাড়ি জমান ইমাম বুখারী [রাহিমাহুল্লাহ] ইমাম মুসলিম [রাহিমাহুল্লাহ] সহ আরও অনেকে।

সালফে সালেহিনের অনন্য গুণাবলী

উত্তম আখলাক ও সচ্চরিত্রে সালফে সালেহিন ছিলেন সর্বাগ্রে। দয়া-অনুগ্রহ, নম্রতা-বিনয় এবং ভদ্রতা ইত্যাদি গুণে ছিলেন অনন্য। অসৎ আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা ছিল তাঁদের সৌন্দর্য। তাঁরা নিফাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় ইবাদতের প্রতি অত্যধিক আগ্রহ, বিভিন্ন নফল আমলের জন্য

আলাদা সময় নির্ধারণ এবং যেসব জিনিস ইবাদতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি করে তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা ছিল সালাফদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য।তুচ্ছ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসিতাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার অনন্য উদাহরণ হলেন আমাদের পূর্ববর্তী সালাফগণ
আমের ইবনে আবদুল্লাহ (রহ.)-কে তাঁর রাতজাগার পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি শুধু দিনে রাত পর্যন্ত রোজা রাখি আর রাতে দিন পর্যন্ত সজাগ থাকি। এটা তেমন বিরাট কিছু তো নয়। (সিলসিলাতু উলুউল হিম্মাহ: ১৬/১০)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে, একই যুগে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম স্তর হল সেই স্তর যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ রয়েছেন। এরপর তাদের পরবর্তী স্তর হল সেই মুমিনগণ যারা সাহাবীদের দেখেছেন কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেননি। এরপর তাদের পরবর্তী স্তর হল তাবেঈনদের অনুসারীগণ। বর্ণনাকারী সাহাবী চতুর্থ শতাব্দীর লোকদের উল্লেখ করতে দ্বিধা করেছেন। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: "তাদের পরে এমন কিছু লোক আসবে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং মানুষ তাদের উপর আস্থা রাখবে না। তাদের সাক্ষ্য চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে এমনকি । তারা প্রতিশ্রুতি দেবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। তারা খাদ্য ও পানীয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় ভোগ-বিলাসে মত্ত হবে, এমনকি তাদের মধ্যে মেদবহুলতা প্রকাশ পাবে।"

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূল (সা)-এর আদর্শের অনুসরণ করতেন তাবেঈগণ ঠিক সেভাবেই সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন। কারণ তারা জানতেন যে, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর জ্ঞান একমাত্র সাহাবীগণের কাছেই নির্ভেজাল অবস্থায় পাওয়া যাবে। ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ عَلَى الطَّرِيقِ مَا كَانَ عَلَى الْأَثَرِ ‘তারা (তাবেঈদের সময়কার লোকেরা) মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন লোক হাদীসের উপর আমল করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (সঠিক) পথেই থাকবে’।[8] তাবেঈগণের অনুসরণ করার দৃষ্টান্ত বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে এসেছে। যেমন-
عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما فَقَالَ أَعْرَابِىٌّ أَخْبِرْنِى قَوْلَ اللَّهِ)وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ (قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.

১. খালিদ ইবনু আসলাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে বের হলাম। এক মরুবাসী তাঁকে বলল, আল্লাহ তা‘আলার বাণী- ‘যারা

সোনা-ও রূপা জমা করে রাখে এবং তার আল্লাহর পথে খরচ করে না-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি সম্পদ জমা করে রাখে আর এর যাকাত আদায় করে না, তার জন্য রয়েছে শাস্তি- এ তো ছিল যাকাত বিধান অবতীর্ণ হওয়ার আগের কথা’।[9]

ইবনু ওমরের সাথীরা তার নিকট থেকে একটি আয়াতের তাফসীর জানার জন্য কতটা উদগ্রীব ছিল। তারা সাহাবী ইবনু ওমর (রাঃ)-এর থেকে আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নিলেন যে, যাকাত দিলে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রযোজ্য হবে না।

،عَنْ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِى نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما فَأَمَرَنِى فَرَأَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِى حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِى أَقِمْ عِنْدِى، فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِى- قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ -فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِى رَأَيْتُ

২. আবূ জামরাহ নাসর ইবনু ইমরান যুবায়ী (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তামাত্তু হজ্জ করতে ইচ্ছা করলে কিছু লোক আমাকে নিষেধ করল। আমি তখন ইবনু আববাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি তা করতে আমাকে নির্দেশ দেন। এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন এক ব্যক্তি আমাকে বলছে, উত্তম হজ্জ ও মাকবূল ওমরাহ। ইবনু আববাস (রাঃ)-এর নিকট স্বপ্নটি বললাম। তিনি বললেন, তা নবী (সা)-এর সুন্নাত। এরপর আমাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমাকে আমার মালের কিছু অংশ দিব। রাবী শুবাহ (রহঃ) বলেন, আমি (আবূ জামরাকে) বললাম, তা কেন? তিনি বললেন, আমি যে স্বপ্ন দেখেছি সে জন্য’।[10] অন্য বর্ণনায় এসেছে, قَالَ :فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ :عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، وَحَجٌّ مَبْرُورٌ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي رَأَيْتُ، فَقَالَ :اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ‘স্বপ্নে আমার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, উমরা কবুল হয়েছে এবং হজ্জও কবুল হয়েছে। আমি ইবনু আববাস (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে এ স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! এতো আবূল কাসিম রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাত’।[11]

অত্র হাদীছে প্রমাণ করে যে, কোন হাদীছের ব্যাখ্যা বুঝতে না পারলে তাবেঈগণ সাহাবীগণের নিকট চলে যেতেন। এমনকি স্বপ্ন দেখেও তার ব্যাখ্যা জানার জন্য তারা আলেম সাহাবীগণের নিকট ছুটে যেতেন। সুন্নাতের সাথে তাবেঈর স্বপ্ন মিলে যাওয়ায় ইবনু আববাস (রাঃ) তাকবীর ধ্বনি দিতেন। ইখতিলাফী বিষয়ে তারা বসে না থেকে সঠিক বিষয়টি জানার জন্য ছুটে গেছেন সাহাবীর নিকট। সাহাবীগণের অনুসরণে তারা কতটা অগ্রগামী হলে এমন অবস্থা হতে পারে তা অনুমেয়’।[12]

عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لاَ يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِى الْحَجِّ ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنه وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ

وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ .قَالَ هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَ نَعَمْ .قَالَ فَأَنْظِرْنِى حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِى ثُمَّ أَخْرُجَ .فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِى وَبَيْنَ أَبِى، فَقُلْتُ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ .فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ صَدَقَ

৩. সালেম (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খলীফা) আব্দুল মালেক (মক্কার গভর্নর) হাজ্জাজের নিকট লিখে পাঠালেন যে, হজ্জের ব্যাপারে ইবনু ওমর-এর বিরোধিতা করবে না। আরাফার দিনে সূর্য ঢলে যাবার পর ইবনু ওমর (রাঃ) হাজ্জাজের তাঁবুর কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে ডাকলেন। আমি তখন তাঁর (ইবনু ওমরের) সাথেই ছিলাম, হাজ্জাজ হলুদ রঙের চাদর পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, কী ব্যাপার, হে আবু আব্দুর রহমান? ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, যদি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চাও তাহলে চল। হাজ্জাজ জিজ্ঞেস করলেন, এ মুহূর্তেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। হাজ্জাজ বললেন, সামান্য অবকাশ দিন, মাথায় পানি ঢেলে বের হয়ে আসি। তখন তিনি তার সওয়ারী হতে নেমে পড়লেন। অবশেষে হাজ্জাজ বেরিয়ে এলেন। এরপর হাজ্জাজ চলতে লাগলেন, আমি ও আমার পিতার মাঝে তিনি চললেন, আমি তাকে বললাম, যদি আপনি সুন্নাতের অনুসরণ করতে চান তাহলে খুৎবা সংক্ষিপ্ত করবেন এবং উকূফে দ্রুত করবেন। হাজ্জাজ আব্দুল্লাহর দিকে তাকাতে লাগলেন। আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন তাঁকে দেখলেন তখন বললেন, সে ঠিকই বলেছে’।[13]

উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের সুন্নাতের প্রতি কতটা আগ্রহ ছিল যে, তিনি চিঠি লিখে হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে হাদীছের অনুসরণের স্বার্থে ইবনু ওমর (রাঃ)-এর বিরোধীতা করতে নিষেধ করলেন। আর হাজ্জাজের মত শাসকও সুন্নাতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য নিজের অহমিকা পরিহার করে হজ্জে সুন্নাতের অনুসরণ করলেন। তারা সর্বদা সাহাবীর অনুসরণ করলেন। কারণ তারা জানতেন একমাত্র সাহাবীগণের নিকটই সুন্নাত নিরাপদে রয়েছে। মুহাল্লাব বলেন, وفيه أن الأمير يجب أن يعمل فى الدين بقول أهل العلم ويصير إلى رأيهم، ‘ইবনু ওমরের হাদীছে এ মর্মে প্রমাণিত হয় যে, আমীরের জন্য আবশ্যক হল দ্বীনের ক্ষেত্রে আহলে ইলম তথা আলেমগণের ফৎওয়া গ্রহণ করা এবং তাদের মতানুসারে নিজেকে পরিচালিত করা’।[14]

[1]. আহমাদ হা/১১৪; ইবনু হিববান হা/৭২৫৪, সনদ ছহীহ।

[2]. বুখারী হা/২৬৫২; মিশকাত হা/৩৭৬৭।

[3]. বুখারী হা/৩৬৫০; মিশকাত হা/৬০০১।

[4]. বুখারী হা/১৪০০; মুসলিম হা/২০; মিশকাত হা/১৭৯০।

[5]. নববী, শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[6]. বুখারী হা/৫৮৭৯।

[7]. ফাৎহুল বারী ১০/৩২৯ পৃ.
[8]. দারেমী হা/১৪০, সনদ ছহীহ।
[9]. বুখারী হা/১৪০৪, ৪৬৬১।
[10]. বুখারী হা/১৫৬৭; আহমাদ হা/২১৫৮।
[11]. মুসলিম হা/১২৪২।
[12]. ফাৎহুল বারী ৩/৪৩১।
[13]. বুখারী হা/১৬৬০।
[14]. ইবনু বাত্তাল, শারহুল বুখারী ৪/৩৩৮। (https://www.tawheederdak.com/)

জীবন্ত সুন্নাহ

ইবাদতে সুন্নাহঃ ইবাদত ইসলামের মৌলিক ভিত্তি এবং একজন মুসলিমের জীবনের অন্যতম প্রধান অংশ। এটি কেবল আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ভক্তির প্রকাশ নয়, বরং মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইবাদত কাকে বলে তা ইবাদত মানুষের আত্মশুদ্ধি, নৈতিকতা, এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে গভীর করে। এটি আখিরাতের মুক্তির প্রধান উপায় এবং দুনিয়াতে শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের পথ।

ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটায় এবং সমাজে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করে। নিয়ত, পবিত্রতা, খুশু ও খুজু, এবং ইখলাসসহ ইবাদতের বিভিন্ন ধাপ সঠিকভাবে পালন করলে ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় এবং একজন মুসলিম আখিরাতে সফলতা লাভ করে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত ইবাদতের গুরুত্ব বুঝে সঠিকভাবে তা সম্পাদন করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।

রাসুল (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইবাদত করা। আল্লাহ বলেন, ‘রাসুল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।’ (সুরা হাশর, আয়াত: ৭)

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যাত।’

(মুসলিম, হাদিস: ১৭১৮)

তিনি আরো বলেন, ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরিয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।’ (বুখারি, হাদিস: ২৬৯৭; মুসলিম, হাদিস: ১৭১৮)

হুজায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) বলেন, ‘যে সব ইবাদত রাসুল (সা.)-এর সাহাবিরা করেননি, সেসব ইবাদত তোমরাও করো না। কেননা পূর্ববর্তী লোকেরা [রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম] পরবর্তী লোকদের জন্য কোনো অসম্পূর্ণতা রেখে যাননি। অতএব হে মুসলিমসমাজ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি গ্রহণ করো।’ (আবু ইসহাক আশ-শাতেবি, আল-ইতিসাম ২/১৩২)

ফুজাইল ইবনু ইয়াজ (রহ.) বলেন, ‘আমল খালেস হলেও যদি তা সঠিক না হয়, তাহলে তা (আল্লাহর কাছে) কবুল হবে না।

আর আমল সঠিক হলেও যদি তা খালেছ না হয়, তাহলেও তা কবুল হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আমলটি খালেস ও সঠিক না হয়। খালেস হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই ইবাদত করা, আর আমলের শুদ্ধতা হলো, রাসুল (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করা।’ (শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া, আল-উবুদিয়াহ ২/৪৭৬)

সুতরাং তাওহিদুল ইবাদত কায়েম করতে হলে দুটি মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। (১) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ইবাদত না করা।অর্থাৎ শিরকমুক্ত ইবাদত করা। (২) কোরআন ও হাদিস অস্বীকৃত কোনো ইবাদত না করা। অর্থাৎ বিদআতমুক্ত ইবাদত করা। (আবদুল্লাহ আল-মাহমুদ- কালের কণ্ঠ, ২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭)

নামাজ বেহেস্তের চাবি। প্রতিটি মুসলিমের জন্য নামাজ পড়া ফরজ বা বাধ্যতামূলক। প্রতিদিন আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি। ফরজ নামাজের পূর্বে এবং পরে দুই রাকাত, চার রাকাত করে যে নামাজ আদায় করি তাকে সুন্নত নামাজ বলে। নবী করীম (সাঃ) বিনা ওজরে কখনো সুন্নত নামাজ পরিত্যাগ করতেন না। তিনি এবং সাহাবীগণ নিয়মিত সুন্নত নামাজ গুরুত্বের সঙ্গে আদায় করতেন।

সুন্নত নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ যখন আমাদের পাপ-পূণ্যের হিসাব গ্রহণ করবেন তখন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নিবেন। বিচার দিবসে আমাদের আমলনামা যদি কম হয়ে যায় তখন মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সুন্নত নামাজ দ্বারা তা পূরণ করবেন। অতএব, সুন্নত নামাজকে খুবই গুরুত্বসহকারে আমাদের আদায় করতে হবে।ফরয নামায ছাড়া অন্যান্য নামায দুই প্রকার। প্রথম প্রকার হল সেই নামায, যা (সময় ও রাকআত সংখ্যা দ্বারা) নির্দিষ্ট নয়। এ নামায নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যে কোন সময়ে অনির্দিষ্ট রাকআতে পড়া যায়। আর দ্বিতীয় প্রকার হল সেই নামায, যা (সময় ও রাকআত সংখ্যা দ্বারা) নির্দিষ্ট। যে নামাযের নির্দিষ্ট সময় ও রাকআত সংখ্যা মহানবী (ﷺ) কর্তৃক প্রমাণিত আছে। এই শ্রেণীর নামায আবার দুই প্রকার; সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ও গায়র মুআক্কাদাহ।

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ সেই সুন্নত নামায, যা মহানবী (ﷺ) ফরয নামাযের আগে-পিছে নিজে পড়েছেন এবং উম্মতকে পড়তে তাকীদ, উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছেন।

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেন, “যে কোন মুসলিম বান্দা প্রত্যহ্ আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে বারো রাকআত নফল (ফরয ব্যতীত সুন্নত) নামায পড়লেই আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য এক গৃহ্ নির্মাণ করেন। অথবা তার জন্য জান্নাতে এক ঘর নির্মাণ করা হয়।” *(মুসলিম, সহীহ ৭২৮-নং, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, তিরমিযী, সুনান)*

তিরমিযীর বর্ণনায় কিছু শব্দ অধিক রয়েছে, “(ঐ বারো রাকআত নামায;) যোহরের (ফরযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পরে দুই রাকআত, এশার পরে দুই রাকআত, আর ফজরের (ফরয নামাযের) পূর্বে দুই রাকআত।”

হযরত আয়েশা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিয়মনিষ্ঠভাবে দিবারাত্রে বারো রাকআত নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে; যোহরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরেবের পর দুই রাকআত, এশার পর দুই রাকআত এবং ফজরের (ফরযের) পূর্বে দুই রাকআত।” (নাসাঈ, সুনান, এবং শব্দগুলি তাঁরই, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান, সহিহ তারগিব ৫৭৭নং)

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"যে ব্যক্তি নিয়ম নিষ্ঠভাবে দিন-রাতে ১২ রাকাত নামাজ পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।জোহরের (ফরজ নামাজের) আগে চার রাকাত ও পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, এশার পর দুই রাকাত এবং ফজরের (ফরজের) আগে দুই রাকাত।"[*নাসাঈ, ইবনে মাজাহ:৫৭৭]*

অন্য একটি হাদিস এসেছে, উম্মে হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, "রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে ও দিনে ১২ রাকাত নামাজ আদায় করলো, জান্নাতে তার জন্য একটি ঘড় নির্মাণ করা হলো। সেগুলো হলো জোহরের (ফরজ নামাজের) পূর্বে চার রাকাত, পরে দুই রাকাত, মাগরিবের পর দুই রাকাত, ইশার পর দুই রাকাত, ফজর নামাজের পূর্বে দুই রাকাত।"

[তিরমিজি, কিতাবুস সালাত:১/ ৪৪০,৪৪৫]

কিছু সুন্নত আছে যা পড়া মুস্তাহাব, কিন্তু তাকীদপ্রাপ্ত নয়। এমন কিছু সুন্নত নামায নিম্নরুপ:-

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেন, “আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি কৃপা করেন যে আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়ে।” (আহমাদ, মুসনাদ, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ, সহিহ তারগিব ৫৮৪নং)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ‘নবী (ﷺ) আসরের পূর্বে ৪ রাকআত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক দুই রাকআতে আল্লাহর নিকটবর্তী ফিরিশ্তা, আম্বিয়া ও তাঁদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের প্রতি সালাম (তাশাহহুদ) দিয়ে তা পৃথক করতেন। আর সর্বশেষে সালাম ফিরতেন।’

(আহমাদ, মুসনাদ, তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৩৭নং)

মহানবী (ﷺ) বলেন, "প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে নামায আছে।" এইরুপ তিনবার বলার পর শেষে বললেন, "যে চাইবে তার জন্য।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৬২নং)

তিনি আরো বলেন, "এমন কোন ফরয নামায নেই, যার পূর্বে ২ রাকআত নামায নেই।" (ইবনে হিব্বান, সহীহ, ত্বাবারানীরানী, মু'জাম, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ২৩২, জামে ৫৭৩০নং) অর্থাৎ, প্রত্যেক ফরয নামাযের পূর্বে ২ রাকআত নামায আছে। সুতরাং এশার ফরযের পূর্বেও আছে। তবে তা সুন্নাতে গায়র মুআক্কাদাহ।

মহানবী (ﷺ) এশার পরে ৪ রাকআত নামাযও ঘরে গিয়ে পড়তেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে আমার খালা মায়মূনার ঘরে শুলাম। দেখলাম, নবী (ﷺ) এশার নামায পড়ে এলেন এবং ৪ রাকআত নামায পড়লেন। (আহমাদ, মুসনাদ, বুখারী ১১৭নং, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান)

নামাজের মধ্যে কিছু করণীয় আছে যা পালন করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। পালন না করলে নামাজ আদায় হয় না, গুনাহ হয়। তা হচ্ছে নামাজের ফরজ। আরো এমন কিছু কাজ আছে, যা পালন করলে নামাজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, মানসিক শান্তি আসে, কিন্তু পালন না করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় না তবে সাওয়াব কম হয়। নামাজের মধ্যে এ পালনীয় বিষয়গুলোকে সুন্নত বলে।। নবী করীম (সা:) নামাজের সুন্নাহ মেনেই নামাজ আদায় করতেন। আমাদেরও নামাজের সুন্নাহ গুলো সঠিকভাবে পালন করতে হবে। সুন্নাহ গুলো পালন করলে আমরা অধিক সাওয়াব পাব এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সুন্নাত কে অনুসরণ করা হবে।

রোযা বা সাওমে সুন্নাহঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদর পূর্ববর্তীদের উপর, যেন তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সূরা বাকারা (২): ১৮৩

কোরআন যে আয়াতটির মাধ্যমে রোজা ফরজ হয়, সেটিতেই ইঙ্গিত রয়েছে যে পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠীর জন্য রোজা ফরজ ছিল। আদম (আ.)-এর সময় আইয়ামে বিজ বা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোজা রাখতে হতো। 'আইয়ামে বিজ' অর্থ শুভ্রতার দিনসমূহ। আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে থাকাকালে নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ফেলায় তাঁদের গায়ের রং কালো হয়ে যায়। তাই ফেরেশতারা তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁরাও

তওবা করেন। ফলে তাঁদের গায়ের রং সাদা ও সুন্দর হয়। এরপর আল্লাহ আদম (আ.) ও তাঁর উম্মতকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা রাখার নির্দেশ দেন। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, 'মহানবী (সা.) আইয়ামে বিজের সিয়াম পালন করতেন।' (নাসায়ি)

নুহ (আ.)-এর যুগেও রোজা পালন করা হতো। মহানবী (সা.) বলেন, 'নুহ (আ.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ছাড়া গোটা বছর রোজা রাখতেন।' (ইবনেমাজাহ)। মহানবী (সা.) আরও বলেন, 'নুহ (আ.)-এর যুগ থেকে প্রতি মাসে তিনটি করে রোজা ছিল।' (ইবনে কাসির)

মুসা (আ.)-এর উম্মতের জন্য আশুরার রোজা ফরজ ছিল। মহানবী (সা.) মদিনায় আসার পর ইহুদিদের আশুরার রোজা পালন করতে দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলল, 'এটি এক শুভ দিন। এই দিনে আল্লাহ বনি ইসরাইলকে তাদের শত্রু থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ফলে মুসা (আ.) আল্লাহর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ওই দিনে রোজা রাখেন।' এ কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, 'তাহলে আমি হজরত মুসা (আ.)-এর অনুসরণে তোমাদের তুলনায় বেশি হকদার।' (বুখারি)। এরপর মহানবী (সা.) আশুরার রোজা রাখেন এবং সাহাবিদের রোজা রাখার নির্দেশ দেন। এরপর রমজানের রোজা ফরজ হলে আশুরার রোজা নফলে পরিণত হয়।

দাউদ (আ.) বছরে ছয় মাস রোজা রাখতেন আর ছয় মাস রোজা রাখতেন না। মহানবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় রোজা হলো দাউদ (আ.)-এর রোজা। তিনি এক দিন রোজা রাখতেন এবং এক দিন বিনা রোজায় অতিবাহিত করতেন।'

ঈসা (আ.)-এর উম্মতের সময়েও রোজার প্রচলন ছিল। ঈসা (আ.)-এর যখন জন্ম হয়, তখন লোকজন তাঁর মা মরিয়মকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'আমি করুণাময়ের উদ্দেশ্যে রোজা পালনের মানত করেছি। তাই আজ আমি কিছুতেই কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' (সুরা মরিয়ম, আয়াত:২৬)

ঈসা (আ.) জঙ্গলে ৪০ দিন রোজা রেখেছিলেন। একবার ঈসা (আ.)-এর উম্মতরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমরা পাপ আত্মাকে কীভাবে বের করব?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'দোয়া ও রোজা ছাড়া তা অন্য কোনো উপায়ে বের হতে পারে না।'

জাহিলি যুগের লোকজন আশুরার রোজা পালন করত। ইবনে ওমর (রা.) বলেন, 'অন্ধকার যুগের লোকজন আশুরার রোজা পালন করত। রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার আগে মহানবী (সা.) নিজে আশুরার রোজা পালন করেছেন। এরপর যখন রমজানের রোজা ফরজ হয়, তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'আশুরা দিনে যে চায় সে ওই দিন রোজা রাখবে এবং যে চায় সে ওই দিন রোজা পরিহার করবে।' (বুখারি)

রমজানের রোজা পালন ফরজ করে আল্লাহ বলেন, রমজান মাস, এতে মানুষের পথপ্রদর্শক ও সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মীমাংসারূপে কোরান অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব, তোমাদের মধ্যে য কেউ এ মাস পাবে, সে যেন এ মাসে অবশ্যই রোজা রাখে। আর যে রোগী বা মুসাফির তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, যাতে তোমরা নির্ধারিত দিন পূর্ণ করতে পার ও তোমাদের সৎপথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করতে পার, আর তোমরা কৃতজ্ঞ হলেও হতে পার। (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৮৫)

আয়াতটি দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে অবতীর্ণ হয়। তারপর ফরজ রোজা চালু হয়।

রমজানরে ফরজ রোজা ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন উপলক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ দিনে রোজা রেখেছেন এবং তাঁর উম্মতকে রোজা রাখতে বলেছেন।

প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি সপ্তাহে ২দিন রোজা রাখতেন। আর তাহলো সোমবার ও বৃহস্পতিবারের দোয়া। এ রোজা পালন প্রসঙ্গে হাদিসে এসেছে-হযরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজার প্রতি বেশি খেয়াল রাখতেন।' (তিরমিজি, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার (আল্লাহ তাআলার দরবারে) আমল পেশ করা হয়। সুতরাং আমার আমলসমূহ যেন রোজা পালনরত অবস্থায় পেশ করা হয়; এটাই আমার পছন্দনীয়।' (মিশকাত, তিরমিজি)

এক দিন পর পর রোজা রাখাকে সাওমে দাউদ বলে। দাউদ (আ.) এভাবে রোজা রাখতেন।নবী (সা.) এটিকে সর্বোত্তম রোজা বলেছেন এবং বেশি রোজা রাখতে আগ্রহীদের এভাবে রোজা রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। (বুখারি, হাদিস: ১৮৭৮; মুসলিম, হাদিস: ২৭৯৩)

প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজাকে আইয়ামে বিজের রোজা বলে। নিয়মিতভাবে এই তিন দিনের রোজা সারা বছর রোজা রাখার সমতুল্য। (বুখারি, হাদিস: ১৮৮০) মহররম মাসের ১০ তারিখ হলো আশুরা। রমজানের রোজা ফরজ হওয়া আগে আশুরার রোজা ফরজ ছিল,

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হলো আল্লাহর মাস মহররম মাসের রোজা অর্থাৎ আশুরার রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাজ। (মুসলিম, হাদিস: ২৮১২)

নবী (সা.) শাবান মাসে খুব বেশি পরিমাণে রোজা রাখতেন। আয়েশা (রা.) বলেন, নবী (সা.) শাবান মাসের চেয়ে কোনো মাসে বেশি রোজা পালন করেননি। তিনি প্রায় পুরো শাবান মাসই রোজা পালন করতেন। (বুখারি, হাদিস: ১৮৬৯; মুসলিম, হাদিস: ২৭৭৯)

রমজানের পর শাওয়াল মাস। অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখার বিষয়ে হাদিসে বর্ণিত আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘যে রমজানের রোজা রাখে, অতঃপর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রাখে, সে যেন বছরজুড়ে রোজা রাখে।’ (মুসলিম, হাদিস: ২৮১৫) জিলহজ মাসের প্রথম থেকে নবম দিন পর্যন্ত মোট ৯টি রোজার ব্যাপারে হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর প্রত্যেক দিনের রোজা এক বছর রোজার সমতুল্য। (তিরমিজি, হাদিস: ৭৫৮)

জিলহজ মাসের নবম দিন হলো আরাফার দিন। এই দিন সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘আমি আশা করি আরাফার দিনের রোজা তার পূর্ব ও পরের এক বছরের পাপ মোচন করে দেবে।’ (মুসলিম, হাদিস: ২৮০৩)

সিয়াম এমনিতেই আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় ইবাদত। আর সেটা যদি আরাফা দিবসে হয়, তাহলে সিয়ামের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটা বেড়ে যাবে, সহজেই অনুমেয়। আরাফা দিবসের রোযা আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয় আমল। মাত্র একদিনের রোযার কারণেই পুরো দুই-দুইটি বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন আল্লাহ তাআলা। এরচেয়ে বেশি আমার আর কী চাই? আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি কত সীমাহীন করুণাময় আর প্রেমময়। যত কঠিন পরিস্থিতিই হোক, আমরা এই অফুরন্ত করুণাধারা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করব না। আরাফা দিবস দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম দিন। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

الْيَوْمُ الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة

প্রতিশ্রুত দিবস হলো কেয়ামতের দিন। আরাফা দিবস হলো যার নিকট উপস্থিত হয়। জুমআর দিন হলো যে উপস্থিত হয়।''

আরাফার দিন আল্লাহ হাজীদের মাফ করে দেন। এ দিন আল্লাহর ক্ষমাপরায়ণতা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পায়। আম্মাজান আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقِ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يباهي بهم المَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاء؟

'আরাফা দিবসের মতো আর কোনো দিন আল্লাহ এত বেশি বান্দাকে ক্ষমা করেন না। সেদিন আল্লাহ বান্দার অনেক বেশি কাছাকাছি চলে আসেন। আরাফার ময়দানে জমায়েত হওয়া হাজীদের নিয়ে আল্লাহ ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন। আল্লাহ জানতে চান এই মানুষগুলো জানমাল ব্যয় করে পরিবার-পরিজন ছেড়ে এখানে এসে কী চায়?"

আল্লাহ তাআলা চান যারা ঘরবাড়ি ছেড়ে আরাফার ময়দানে আসতে পারেনি, তারাও এই দিনের ফয়েয-বরকত হাসিল করুক। ঘরবাড়িতে অবস্থান করেও তারা আল্লাহর অফুরন্ত ক্ষমা লাভের সৌভাগ্য অর্জন করুক। বান্দাদের প্রতি অপূর্ব করুণাবশত তিনি তার রাসূলকে

এই অপূর্ব সুন্নত শিখিয়ে দিয়েছেন। যারা হজে যেতে পারেনি তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ এই রোযার আমল প্রবর্তন করে দিয়েছেন। নবীজি উৎসাহব্যঞ্জক ভঙ্গিতে এই রোযার প্রতি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে গেছেন

আখলাকে সুন্নাহঃ

মানব জীবনে আদব বা শিষ্টাচার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজ আমাদের সমাজে নেই সুসম্পর্কের সবুজ আচ্ছাদন। বাক্যবিনিময়ে নেই কোমলতার কোনো চিহ্ন। কথোপকথন ও গালাগালের প্রাবাল্য পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে। কারও সঙ্গে প্রথম দেখাতে সালাম, আদাব জ্ঞাপন ও কুশলাদি জানার আগ্রহ ছিল শিষ্টাচার।

আজ যেন এর সবই নির্বাসিত। ইসলামে ফরজ বিধানগুলো পালনে যেভাবে তাকিদ দিয়েছে, তেমনি আচার আচরণে বা ব্যাবহারেও দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা’আলা মানুষকে সুন্দর ও উত্তম কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন। ‘তোমরা মানুষের সঙ্গে উত্তম ও সুন্দর কথা বলো।’ (সূরা বাকারা : ৮৩) রাসূল (সাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের মধ্যে যার আচার-ব্যবহার সুন্দর, সে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে।’ (সুনানে তিরমিজি)। যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ অন্ধকারে নিমজ্জিত, পথহারা, দিশেহারা মানুষদেরকে আলোর পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন সুন্দর আচরণের মাধ্যমে। আজকের দিনে এসেও মানুষকে সত্য সুন্দর কল্যাণের পথে আনার ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে ভূমিকা পালন করছে।

সুন্দর আচরণ কাকে বলে : সুন্দর ব্যবহার সুন্দরভাবে কথা বলা সুন্দর মনের পরিচয় বহন করে। সুন্দর আচরণ বলতে আমরা বুঝি কারও সাথে সুন্দর করে কথা বলা, দেখা হলে সালাম দেয়া, কুশলাদি জিজ্ঞেস করা, কর্কশ ও কঠিন ভাষায় কথা না বলা, ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত না হওয়া, ধমক বা রাগের সুরে কথা না বলা, গিবত বা পরনিন্দা না করা, অপমান-অপদস্থ না করা, উচ্চ আওয়াজে কথা না বলা, গম্ভীর বা কালো মুখে কথা না বলা, সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা, অন্যের সুখে সুখী হওয়া এবং অন্যের দুঃখে দুঃখী হওয়া, বিপদে দেখা করে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ করা সুন্দর আচরণের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের ভালো-মন্দ পরিচয় নির্ভর করে সুন্দর আচরণের ওপর। সুন্দর আচরণের মাধ্যমে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

সুন্দর আচরণের গুরুত্ব : ইসলামে সুন্দর আচরণের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একজন মানুষের জীবনে সুন্দর আচরণ ও সৌজন্যবোধ শিক্ষা ও অনুসরণ করার গুরুত্ব ও

প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে সুন্দর আচরণ : পবিত্র আল-কুরআনে সুন্দর আচরণের ব্যাপারে অনেক আয়াত রয়েছে। আল্লাহর নবীও ছিলেন সুন্দর আচরণের মূর্তপ্রতীক। নিম্নে সুন্দর আচরণ সম্পের্কে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হলো : আল্লাহ্ বলেন, আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন, পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন। (সূরা আল-ইমরান : ১৫৯)। আল্লাহ্ বলেন, মুমিনদের জন্য আপনি আপনার ডানা অবনমিত করুন অর্থাৎ কোমল আচরণ করুন। (সূরা হিজর : ৮৮)। আল্লাহ্ বলেন, কেউ যখন তোমাকে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ জানাবে প্রতি-উত্তরে তুমি তাকে তার চাইতে সুন্দর ধরনের সম্ভাষণ জানাও, কিংবা অন্তত ততটুকুই জানাও। (সূরা নিসা ৮৬)।

আল্লাহ্ বলেন, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার তথা সুন্দর আচরণ করবে এবং মানুষকে সুন্দর কথা বলবে। (সূরা বাকারা : ৮৩)। মহান আল্লাহ্ বলেন, তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতিম, দরিদ্র, প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথিক এবং যারা তোমাদের অধিকারে এসেছে, সবার সাথে সুন্দর আচরণ কর। (সূরা নিসা : ৩৬)। আল-কুরআনে ইরশাদ হচ্ছ, পৃথিবীতে দম্ভভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূপৃষ্ঠকে কখনোই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পর্বত সমান হতে পারবে না। এসবের মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়। (সূরা বনি ইসরাইল : ৩৭-৩৮)। স্বয়ং রাসূল (সাঃ) ছিলেন উত্তম নৈতিক চরিত্রের সর্বোত্তম মডেল। আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আপনি উত্তম নৈতিক চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' (সূরা আল-কালাম : ৪)। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'রহমান-এর বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।' (সূরা আল-ফুরকান : ৬৩)।

হাদিসের দৃষ্টিতে সুন্দর আচরণ : পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি হাদিসেও সবার সাথে সুন্দর আচরণ করতে এবং দয়া, সহানুভূতি ও কোমলভাবে কথা বলতে বলা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, প্রিয়নবী (সা) এরশাদ করেছেন, উত্তম কথা বা ভালো কথাও একটি সাদকা। (বুখারি ও মুসলিম)। প্রিয়নবী (সা) এরশাদ করেছেন, সদকা বা দান-খয়রাত মানুষকে শোচনীয় মৃত্যু হতে রক্ষা করে আর সুন্দর আচরণ আয়ুবর্ধক হয়। সুন্দর আচরণকারীকে আল্লাহ্ ভালোবাসেন। রাসূল (সা) বলেন, আল্লাহ্ কোমল ব্যবহার করেন, তাই সব ব্যাপারে তিনি কোমল আচরণ পছন্দ করেন। (বুখারি ও মুসলিম)। যে ব্যক্তি সুন্দর

আচরণ থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকেও সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত। (মুসলিম)। রাসূল (সা) বলেন, মুমিন হয় উত্তম চরিত্রের অধিকারী। অর্থাৎ সে বদমেজাজি, বিদ্বেষভাবাপন্ন ও মানুষের সাথে রুক্ষ আচরণকারী হয় না। এটা মুমিনের শান নয়। মুসলমান তো অন্যের সাথে নম্র আচরণ করবে, রুক্ষ আচরণ করবে না। রাসুল (সা) বলেছেন, 'সুন্দর আচরণই নেক আমল।' (সহিহ মুসলিম)। রাসূল (সা) আরও বলেছেন, 'যার আচার-ব্যবহার সুন্দর, আমি তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ির নিশ্চয়তা প্রদান করছি।' (আবু দাউদ)। নবী করীম (সা) এরশাদ করেছেন, 'তোমার ভাইয়ের সাথে মুচকি হাসির বিনিময় করাও সদকার সওয়াব হয়ে যায়।' (তিরমিজি)। তিনি এরশাদ করেন, 'সর্বোত্তম ঈমানদার হচ্ছে ঐ লোক যার চরিত্র সর্বোত্তম। আর তোমাদের মধ্যে সে লোকগুলো সর্বোত্তম যারা তাদের স্ত্রী-পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণে অভ্যস্ত।' (আহমদ/তিরমিজি)। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'নেক আমল তো হচ্ছে উত্তম চরিত্র।' (মুসলিম)
রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, 'উত্তম নৈতিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহারের ন্যায় নেকির পাল্লা ভারী করতে আর দ্বিতীয় কোনো আমল নেই। আর আল্লাহ্ অশ্রাব্য গালমন্দ ও কটুকথা বলে এমন ব্যক্তিকে খুবই ঘৃণা করেন।' (তিরমিজি/আবু দাউদ)। আয়িশাহ (রা) হতে বর্ণিত, নবী (সা) বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ হলেন নম্র ও দয়ার্দ্র, তিনি প্রতিটি কাজে নম্রতা ও দয়ার্দ্রতা প্রদর্শন পছন্দ করেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৬৮৯)। আবু হুরাইরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মুমিন ব্যক্তি সরল ও ভদ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু পাপি ব্যক্তি ধোঁকাবাজ ও নির্লজ্জ হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৯০)।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে বলেন, اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ 'আমি তো প্রেরিত হয়েছি উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য।' (কানযুলউম্মাল)। শুধু তাই নয়, কুরআন-হাদীসের বাইরে ইসলামের সর্বশেষ নবীকে নিয়ে তাঁর প্রতিবেশী মক্কার কাফির-মুশরিকরা তাঁর শিষ্টাচারে মন্তব্য করেছে "আল-আমীন" তথা বিশ্বাসী। (নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে)।
উত্তম চরিত্র ও ভাল ব্যবহার নিয়ে দিকনির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআন ও হাদীছে নববীতে। আহার-পানীয় গ্রহণে, অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়ে, সালাম আদান-প্রদানে, অনুমতি গ্রহণে, ওঠাবসা, কথা বলা, আনন্দ ও শোক প্রকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুমিনের আচরণ কিরূপ হবে তার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে।
কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি ক্ষমার নীতি গ্রহণ কর। লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চল' (সূরা আ'রাফ ৭/১৯৯)। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ আরো বলেন, 'যারা সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় (আল্লাহর রাস্তায়) ব্যয় করে, যারা ক্রোধ দমন করে ও

মানুষকে ক্ষমা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন' (সূরা আল ইমরান ৩/১৩৪)।

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) চারিত্রিক ও মৌখিক অশ্লীলতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন, 'নবী করীম (সা.) কাউকে গালি দিতেন না, অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করতেন না এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করতে হলে শুধু এটুকু বলতেন, তার কী হয়েছে। তার কপাল ধুলায় ধূসরিত হোক'।

তিনি আরো বলেন, 'আমি দীর্ঘ দশ বছর রাসূল (সা.)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। তিনি আমার ব্যাপারে কখনো 'উহ' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। আর তিনি কখনো বলেননি, তুমি কেন এটা করেছ কিংবা এটা কেন করনি'?

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে মানুষের সাথে আচরণের দিক দিয়ে উত্তম। (সহিহ বুখারি: ৩৫৫৯, সহিহ মুসলিম: ২৩২১)

আব্দুর রহমান ইবনে আবদে রাব্বিল কা'বা থেকে বর্ণিত আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যে পছন্দ করে তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান রাখে এবং অন্যের সাথে এমন ব্যবহার করে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (সহিহ মুসলিম: ১৮৪৪)

পারিবারিক জীবনে সুন্নাহ

সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তিই হলো পরিবার। পরিবার বলতে স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, ভাইবোনদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একান্নভুক্ত পরিমণ্ডলকে বোঝায়। এদের সমন্বয়ে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব অত্যধিক। মহান আল্লাহ তায়ালার হিকমত যে, তিনি আদি পিতা হজরত আদম আ. ও আদি মাতা হাওয়ার আ. এর মাধ্যমে পৃথিবীতে পারিবারিক জীবনের সূচনা করেছিলেন, যা আজও বিদ্যমান।

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীর সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন (রুম-২১)।

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন- তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের পোশাকস্বরূপ (বাকারা-১৮৭)। আল্লাহ আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করেনি, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা

সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিয়েতে সামর্থ্য নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে, যে পর্যন্ত না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেন (নূর-৩২-৩৩)।

রাসুল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত তরিকা ছেড়ে চলবে, সে আমার দলভুক্ত নয়' (বুখারি-৪৬৭৫)। ইসলামে বৈরাগ্যবাদে স্থান নেই। তাই মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে পারে না। হাদিসে এসেছে- 'যখন কোনো বান্দা বিয়ে করল, তখন সে তার ইমানের অর্ধাংশ পূর্ণ করল (মিশকাত)। 'ইসলামে বৈরাগ্যতা নেই এবং বৈরাগ্য জীবনযাপন করাকে রাসুল সা. নিষেধ করেছেন (আবি শায়বাহ: ১০/৫)।

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়নে পরিবারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা পারিবারিক বন্ধনকে মজবুত করার লক্ষ্যেই পরিবারের প্রথম বিন্যাস বৈবাহিক চুক্তির পদ্ধতি চালু করেছেন, যা হজরত আদম ও হাওয়ার আ. এর মাধ্যমে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। পারিবারিক জীবনেও আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার হুকুম মোতাবেক চলতে হবে। স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জন্য আয়-উপার্জন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা, সদাচার-সদ্ব্যবহার এই সবকিছুর পেছনে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করার প্রেরণা কার্যকর থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হলে এ কাজগুলোতেও সওয়াব পাওয়া যাবে। এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

‘যখন মুসলিম তার পরিবারের জন্য খরচ করে এবং এর বিনিময়ে সওয়াবের আশা করে, এটা তার জন্য সদকারূপে পরিগণিত হবে।’ —সহীহ বুখরী, হাদীস ৫৩৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০০২ হযরত আবু মাসউদ বদরী রা.-এর সূত্রে

হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবনের দিকনির্দেশনা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। পারিবারিক জীবনে সুখ, শান্তি ও সফলতা অর্জনের জন্য হাদিসে বিশেষ কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হলো:

১.পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"

(বুখারি: ৮৯৩, মুসলিম: ১৮২৯)

এই হাদিসে প্রতিটি পরিবারের সদস্যকে দায়িত্বশীল হতে বলা হয়েছে। পরিবারের শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.সদাচরণ ও সহমর্মিতা প্রদর্শন

আয়েশা (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম।"

(তিরমিজি: ৩৮৯৫)

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালো আচরণ, সন্তানদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এবং পরিবারের সবার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সুখী পারিবারিক জীবনের মূল চাবিকাঠি।

৩.সন্তানদের সঠিক শিক্ষা ও আদব শেখানো

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"পিতার সন্তানের প্রতি সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো, তাকে সঠিক শিক্ষা দেওয়া।"

(তিরমিজি: ১৯৫১)

সন্তানদের ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার জন্য পিতামাতার দায়িত্ব অপরিসীম।

৪.নারীদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা

হাদিসে এসেছে:

"মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম।"

(তিরমিজি: ১১৬২)

পরিবারে নারীদের অধিকার রক্ষা করা এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া শান্তিপূর্ণ জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান।

৫.পরিবারে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"ধৈর্য হলো ঈমানের অর্ধেক।"

(তিরমিজি: ২০০৭)

পরিবারে সমস্যা বা মতবিরোধ দেখা দিলে ধৈর্যশীল হওয়া এবং সহিষ্ণু আচরণ করা উচিত।

৬.সালামের প্রচলন

হাদিসে বলা হয়েছে:

"তোমরা নিজেদের মধ্যে সালাম প্রচার করো, এতে পরস্পরের ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।"

(মুসলিম: ৫৪)

পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সালামের আদান-প্রদান সম্পর্কের উন্নতি ঘটায় এবং হৃদ্যতা বৃদ্ধি করে।

৭.একসঙ্গে খাবার গ্রহণ করা

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"তোমরা একত্রে খাও, এতে বরকত হবে।"

(ইবনু মাজাহ: ৩২৫১)

পরিবারের সদস্যদের একসঙ্গে বসে খাবার খাওয়ার অভ্যাস পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।

৮.পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

"তারা তাদের কাজ পরামর্শের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।"

(সুরা শূরা: ৩৮)

পরিবারের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত।

৯.পরস্পরের প্রতি দোয়া করা

হাদিসে এসেছে:

"মুমিনের জন্য দোয়া করা তার প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন।"

(মুসলিম: ২৭৩৩)

পরিবারের সদস্যদের জন্য নিয়মিত দোয়া করা পারস্পরিক ভালোবাসা ও মঙ্গল বৃদ্ধি করে।

হাদিসের আলোকে পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দায়িত্বশীলতা, সদাচরণ, সহমর্মিতা এবং ধৈর্যশীলতা অপরিহার্য। প্রতিটি মুসলিম পরিবারের উচিত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই দিকনির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে পারিবারিক জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলা।

প্রতিবেশির প্রতি শিষ্ঠাচার বা আদাব এবং সুন্নাহ

বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে। কাজেই এই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা যরূরী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এই নির্দেশ প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়।প্রতিবেশীর আরবী প্রতিশব্দ جار (জার) এবং ইংরেজী প্রতিশব্দ Neighbour. পারিভাষিক অর্থে- A person who lives next to you or near you. 'তোমার পরে বা পার্শ্বে বসবাসকারী লোক।[1]

ইবনুল মানযূর বলেন, ،وهو مَنْ جاورك جوارًا شرعيًا سواء كان مسلمًا أو كافرًا، برًا أو فاجرًا صديقًا أو عدوًا، محسناً أو مسيئاً، نافعًا أو ضارًا، قريبًا أو أجنبيًا، بلديًاً أو غريبًا. 'প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি আইনত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী।[2]

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা: কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- (১) হাসান (রাঃ) বললেন, ،أربعين داراً أمامه وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره. অর্থাৎ নিজের ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)।[3] (২) কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। (৪) যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। (৫) কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়।[4]

প্রতিবেশীর প্রকার: দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার: ১. নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২. দূরবর্তী প্রতিবেশী *(নিসা ৪/৩৬)*। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা- ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী। আচার-আচরণের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী দুই প্রকার। ১. উত্তম প্রতিবেশী ও ২. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন, مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ: الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ

الصَّالِحُ، وَالْمَرَاكَبُ الْهَنِيْءُ 'একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ'।[5]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ- 'আল্লাহর নিকট সেই সাথী উত্তম, যে তার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম'।[6]

পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট প্রতিবেশী হ'তে রাসূল (সাঃ) দো'আ করতেন এই বলে, اَللَّهُمَّ !إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمَقَامِ فَإِنَّ جَارَ الدُّنْيَا يَتَحَوَّلُ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হ'তে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে'।[7]

প্রতিবেশী সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ: প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল (সাঃ)-কে জিবরীল (আঃ) বার বার তাকীদ করতেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, مَا يُوْصِيْنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ. 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হ'ত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'।[8]

উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার: প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া যরূরী। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَاعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

'আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' (নিসা ৪/৩৬)। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা প্রতিবেশীরাই মানুষের বিপদ-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই এসব লোকের সাথে ভাল আচরণ করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (সাঃ) বলেন, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে'।[9] অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَحْسِنْ- إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا 'তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ'লে তুমি মুমিন হ'তে পারবে'।[10]

প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মধ্যেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর ভালবাসা নিহিত আছে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّحِبَّ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيُصْدِقْ

حَدِيْثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلِيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُوْتُمِنَ وَلِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে সে যেন সদা সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিবেশীর উপকার করে'।[11]

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া : সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ও সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা যরূরী। নিজেকে নিয়ে যে সদা ব্যস্ত থাকে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত যে অন্য কিছুই ভাবে না, প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।[12] প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা পাপ। এমনকি তা ঈমানহীনতার পরিচায়ক।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন, وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، قَالُوْا وَمَا ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ الْجَارُ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।[13] প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। রাসূল (সাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'।[14]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! إِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِيْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةَ تُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلَا تُؤْذِيْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ- 'অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম ছিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং ছালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হ'ল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।[15]

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা: প্রতিবেশীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা এতে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ

(সাঃ) বলেন, أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ- 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ করা হবে'।[16]

প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য না করা: প্রতিবেশীকে কষ্ট দিতে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন এবং কষ্ট দানকারীকে ঈমানহীন বলে অভিহিত করেছেন। এরপরও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া ও নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এমর্মে বর্ণিত হয়েছে, আবু আমের হিমছী বর্ণনা করেন, ছাওবান (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, مَا مِنْ رَجُلَيْنِ يَتَصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، فَيُهْلِكُ أَحَدُهُمَا، فَمَاتَا وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصَارِمَةِ، إِلاَّ هَلَكَا جَمِيْعاً، وَمَا مِنْ جَارٍ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيُقْهِرُهُ، حَتَّى يَحْمِلَهُ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَّخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، إِلاَّ هَلَكَ.

অর্থাৎ যখন দু'ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন তাদের একজনের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর যদি দু'জনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয়। আর যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।[17]

প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া: উপহার আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সাঃ) বলেন, تَهَادُوْا تَحَابُّوْا- 'পরস্পরকে উপহার দাও। এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'।[18]

হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِى جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِى قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا- অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট উপঢৌকন পাঠাব? রাসূল (সাঃ) বললেন, 'যার দরজা (বাড়ী) তোমার বেশী নিকটবর্তী'।[19]

বাড়ীতে ভাল কোন খাদ্য বা তরকারী পাক হ'লে তাতে প্রতিবেশীকে শরীক করা রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর (রাঃ)-কে বলেন, يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ 'হে আবু যর! যখন কোন তরকারী পাক করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও'।[20] অন্য বর্ণনায় আছে, وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوْفٍ 'যখন ঝোল পাকাবে তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করবে ও তা তাদেরকে সদিচ্ছা সহকারে বিতরণ করবে'।[21] তিনি আরো বলেন, إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَ الْمَرَقَةِ وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ أَوْ اَقْسِمْ فِيْ جِيْرَانِكَ 'যখন ঝোল পাকাও, তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তা প্রতিবেশীদের মাঝে বিতরণ করবে'।[22]

প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক না কেন সকলেই উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী। বাড়ীতে কোন ভাল জিনিস তৈরী হ'লে কিংবা পশু-পাখি যবেহ করা হ'লে তার গোশ্ত মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় বিধর্মী প্রতিবেশীর বাড়ীতেও প্রেরণ করা উচিত। একবার আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর বালক ভৃত্য একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, হে বৎস! কাজ শেষ করে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী হ'তে (গোশ্ত বিতরণ) শুরু করবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে উঠল, কি ইহুদী? আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে শুনেছি।[23]

প্রতিবেশীর জন্য নিজের পসন্দনীয় বস্তু এখতিয়ার করা: নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পসন্দ করবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেন, **وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لاَ يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ**- 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা প্রতিবেশী অথবা তার ভাইয়ের জন্য পসন্দ না করবে'।[24]

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে ভুরিভোজ না করা : দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আবার ধনী-দরিদ্রও আল্লাহ করে থাকেন। সুতরাং দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া আবশ্যক। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেন, لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ- 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।[25]

প্রতিবেশীর দাওয়াত কবুল করা: সমাজের মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আন্তরিকতা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। আর পরস্পরকে দাওয়াত দিলে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়। দাওয়াত কবুল করা রাসূলের নির্দেশও বটে। তিনি বলেন, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. 'যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য দাওয়াত দেয়া হয়, তখন সে যেন তাতে সাড়া দেয় বা দাওয়াত কবুল করে। অতঃপর ইচ্ছা হ'লে সে খাবে আর না হ'লে সে ছেড়ে দিবে'।[26] অন্য বর্ণনায় এসেছে, إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ يَعْنِى الدُّعَاءَ. 'যখন তোমাদের কাউকে খাবারের জন্য আহবান জানানো হয়, তখন সে তাতে সাড়া দিবে। যদি সে ছায়েম হয়, তাহ'লে সে দো'আ করবে'।[27]

মুসলমানের ছয়টি হকের অন্যতম হচ্ছে দাওয়াত কবুল করা। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ .قِيْلَ مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ. 'একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টা হক আছে। বলা হ'ল সেগুলি কি হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তিনি বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সালাম দিবে; তোমাকে দাওয়াত

দিলে কবুল করবে; পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবে; হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে'।[28]

প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা: প্রতিবেশীর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা ইসলামের নির্দেশ। এমনকি নিজের কিছুটা ক্ষতি হ'লেও প্রতিবেশীর সুবিধা করে দেওয়া ও তার অসুবিধা না করার নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (সাঃ) বলেছেন, لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ 'এক প্রতিবেশী যেন অপর প্রতিবেশীকে দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে'।[29]

প্রতিবেশীর জান-মাল, ইয্যত-আব্রু হেফাযত করা: প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন যরূরী, তেমনি মাল-সম্পদ হেফাযত করাও অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (সাঃ) বলেন, الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ 'মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপত্তা লাভ করে'।[30] অন্য হাদীছে এসেছে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, سَأَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ :عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوْا حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ لأَنْ يَزْنِىَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِىَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرَقَةِ؟ قَالُوا حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ، فَقَالَ :لأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ جَارِهِ. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা তাঁর ছাহাবীগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, (তা কেমন? উত্তরে) তারা বললেন, হারাম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্ত্ত-সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর'।[31]

প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা: মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ভাল এবং মন্দগুণের সমন্বয়ে মানুষ। প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দোষ গোপন রাখবেন। রাসূল (সাঃ) বলেন, لاَ يَسْتُرُ اللهُ عَلَى عَبْدٍ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো দোষ গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন'।[32]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন'।[33] অন্যত্র তিনি আরো বলেন, مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِىْ بَيْتِهِ- 'যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।

আর যে মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তাকে অপদস্ত করবেন তার ঘরের ভিতরে’।[34]

প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ করা ও তাকে কর্যে হাসানা প্রদান করা:

পার্থিব জীবনে মানুষ অপরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না। এজগতে কোন মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং সে কোন না কোন ক্ষেত্রে অপরের মুখাপেক্ষী। প্রতিবেশীর কাজে সাধ্যমত সহায়তা করা তার প্রতি দয়ার বহিঃপ্রকাশ। আর মানুষের প্রতি মানুষের দয়া-অনুগ্রহে সমাজ সুন্দর হয়; আল্লাহর রহমত লাভ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ ‘আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তির উপর দয়া করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না’।[35]

প্রতিবেশী কখনও সমস্যায় পড়লে কর্যে হাসানা দিয়ে তাকে সাহায্য করা উচিত। তাকে কর্যে হাসানা দিয়ে সাহায্য করলে আল্লাহ তা‘আলা সাহায্যকারীকেও সাহায্য করবেন। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ-

‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আললাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে’।[36]

প্রয়োজনে প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা। এটা এমন একটি সৎকাজ যার কারণে আল্লাহ দাতাকে অনেক পুণ্য দান করে থাকেন। এর ছওয়াব বহুগুণ হয় এবং এর দ্বারা অপরাধ ক্ষমা করা হয়। মহান আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ‘যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তিনি তোমাদের জন্যে তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন’ *(তাগাবুন ১৭)*। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য সাধ্যমত অভাবী প্রতিবেশীকে কর্যে হাসানা প্রদান করা।

কর্যে হাসানার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ ‘ছাদাক্বার ছওয়াব দশগুণ এবং কর্যে হাসানার ছওয়াব আঠারগুণ’।[37] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ‘যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি তার অপর কোন মুসলিম ভাইকে দু’বার ঋণ প্রদান করে তবে তার আমলনামায় এ অর্থ একবার ছাদাক্বা করে দেয়ার সমান ছওয়াব লিখা হবে’।[38]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (সাঃ) বলেন, كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ- 'এক ব্যক্তি লোকদেরকে ঋণ দিত। সে তার কর্মচারীকে বলত, কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধে অক্ষম দেখলে তাকে ক্ষমা করে দিও। এ কাজের বিনিময়ে আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর পর আল্লাহর নিকট পৌঁছলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'।[39]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ- 'যে ব্যক্তি এ কামনা করে যে আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দান করুন, সে যেন ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহজ পন্থা অবলম্বন করে কিংবা মাফ করে দেয়'।[40]

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَنْجَاهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ القِيامَةِ- 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন'।[41]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْ مُعْسِرٍ أَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ- 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় তাকে ছায়া দান করবেন'।[42]

প্রতিবেশীর অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া ও সেবা করা : রোগাক্রান্ত ও অসুস্থ হ'লে মানুষ অসহায় ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কোথাও যেতে পারে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তার সময় কেটে যায়। এমতাবস্থায় কেউ পাশে গিয়ে সান্ত্বনা দিলে সে স্বস্তি বোধ করে। অনুরূপভাবে অসুস্থ প্রতিবেশীকে দেখতে গেলে তাকে সে আপন মনে করে। তাছাড়া অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজ-খবর নেয়া মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। রোগীর দেখা-শোনা ও সেবা-শুশ্রূষাকে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ- 'ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান কর, রুগ্ন ব্যক্তির দেখাশুনা কর এবং বন্দীকে মুক্ত কর'।[43] অন্যত্র তিনি বলেন, عُوْدُوا الْمَرِيْضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে, তাহ'লে তা তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।[44]

রোগীকে দেখতে যাওয়া ও সেবা-শুশ্রূষা করা বিরাট পূণ্যের কাজও বটে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِىْ خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ 'কোন মুসলিম যখন তার কোন রুগ্ন মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে যেন জান্নাতের বাগানে ফল আহরণ করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে'।[45] রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا خَاضَ فِى الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ اسْتَقَرَّ فِيْهَا. 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে

যায়, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন সে রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[46]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً. 'কোন ব্যক্তি কোন রোগীকে দেখতে গেলে অথবা আল্লাহর ওয়াস্তে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহবানকারী (অন্য বর্ণনায় রয়েছে আল্লাহ তা'আলা) তাকে ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ'।[47] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُسلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَه عَشِيَّةً إلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَه خَرِيْفٌ فِيْ الْجَنَّةِ. 'যে কোন মুসলমান সকাল বেলা কোন মুসলমান রোগীকে গেলেই তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। আর সন্ধ্যা বেলা কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করতে থাকে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান সুনির্ধারিত করে দেয়া হয়'।[48]

প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা দেওয়া: প্রতিবেশীর যে কোন দুঃখ-শোকে তার পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيْبَةٍ إلاَّ كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 'যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন'।[49]

প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ: এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে ছয়টি হক রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল কেউ ইন্তিকাল করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।[50]

অন্যত্র রাসূল (সাঃ) বলেন, حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ 'এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, আহবানে সাড়া দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া'।[51]

জানাযায় অংশগ্রহণে প্রতিবেশীর হক যেমন আদায় হয়, তেমনি এতে অশেষ ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (সাঃ) বলেন, مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় কোন মুসলমানের জানাযার অনুগমন করে এবং তার জানাযার ছালাত আদায় ও দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকে, সে দুই ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রতিটি ক্বীরাত হ'ল ওহোদ

পর্বতের মতো। আর যে ব্যক্তি শুধু তার জানাযা আদায় করে, তারপর দাফন সম্পন্ন হবার পূর্বেই চলে আসে, সে এক ক্বীরাত ছওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে’।[52]

প্রতিবেশীর মৃত্যু হ’লে তার পরিবারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ’ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মু’তার যুদ্ধে জা‘ফর (রাঃ) শহীদ হ’লে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ أَوْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ ‘তোমরা জা‘ফরের পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর। কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে’।[53]

প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার: কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)!

إِنَّ لِيْ جَاراً يُؤْذِيْنِيْ، فَقَالَ :اِنْطَلِقْ .فَأَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ .فَانْطَلَقَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوْا :مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ :لِيْ جَارٌ يُؤْذِيْنِيْ، فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيْ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: اِنْطَلِقْ .فَاَخْرِجْ مَتَاعَكَ إِلَى الطَّرِيْقِ فَجَعَلُوْا يَقُوْلُوْنَ :اَللَّهُمَّ اَلْعِنْهُ، اَللَّهُمَّ أَخْزِهِ، فَبَلَغَهُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى مَنْزِلِكَ، فَوَاللهِ !لاَ أُوْذِيْكَ.

অর্থাৎ আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তা নবী করীম (সাঃ)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এর উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হ’ল। সে তখন বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না’।[54]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَارَهُ، فَقَالَ :اِحْمِلْ مَتَاعَكَ، فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيْقِ، فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنْهُ .فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ. فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :مَا لَقِيْتَ مِنَ النَّاسِ؟ فَقَالَ :إِنَّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ. ثُمَّ قَالَ لِلَّذِيْ شَكَا :كَفَيْتَ أَوْ نَحْوَهُ. একদা এক ব্যক্তি এসে তার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-এর দরবারে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, যাও তোমার দ্রব্য-সামগ্রী উঠিয়ে রাস্তায় রেখে দাও। তখন যে রাস্তা অতিক্রম করবে, সে তাকে অভিসম্পাত দিবে। (সে ব্যক্তি তা-ই করল) ফলে রাস্তা অতিক্রমকারী প্রত্যেকেই সেই প্রতিবেশীটিকে অভিসম্পাত দিতে

লাগল। তখন সে ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ’ল। তখন তিনি বললেন, লোকদের নিকট থেকে তুমি কি পেলে? এরপর তিনি বললেন, লোকজনের অভিসম্পাতের পরও রয়েছে আল্লাহর অভিসম্পাত। অতঃপর অভিযোগকারীকে বললেন, তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেছে। অথবা তিনি অনুরূপ বললেন।[55]

প্রতিবেশীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা: প্রতিবেশীদের মাঝে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহর নির্দেশ, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. ‘নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে’ (হুজুরাত ৪৯/১০)। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. ‘মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ’লে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহ’লে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়ছালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন’ (হুজুরাত ৪৯/৯)।

বিবাদ মীমাংসা করা শরী‘আতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ ‘আমি কি তোমাদেরকে ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না? ছাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! তিনি বললেন, إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. ‘বিবাদমান বিষয়ে মীমাংসা করা’।[56]

মুসলিম ভাইদের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করে দিলে ছাদাক্বা করার ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ‘তোমার দুই ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার-ফায়ছালা করা একটি ছাদাক্বা’।[57]

প্রতিবেশীকে হত্যা করা ক্বিয়ামতের আলামত: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করতে বলেছেন এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছেন। অথচ বর্তমানে তুচ্ছ কারণে মানুষ প্রতিবেশীকে হত্যা পর্যন্ত করছে। এটা ক্বিয়ামতের পূর্ব লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ جَارَهُ وَأَخَاهُ وَأَبَاهُ- ‘ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ না কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশী, তার ভাই এবং পিতাকে হত্যা করবে’।[58]

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিবেশীর হক অত্যধিক। তাদের সাথে সদাচরণ করা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য। তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা রাসূলের নির্দেশ। খাদ্য আদান-প্রদান ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। প্রতিবেশীর হক আদায় না করলে এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার না করলে জান্নাত পাওয়া দুষ্কর হবে।

তাছাড়া সমাজকে সুন্দর করার জন্য প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং তার সাথে সদাচরণ করা যরূরী। এতে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। প্রতিবেশীর হক আদায় করলে পার্থিব জীবনে উপকারের পাশাপাশি পরকালীন জীবনেও অশেষ ছওয়াব অর্জিত হবে।

[1].A S Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, (New York : Oxford University Press, p. 1024.

[2]. লিসানুল আরব ৪/১৫৩-৫৪ পৃঃ।[3]. আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯, সনদ হাসান।[4]. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আত-তাক্বছীর ফী হুকূকিল জার, ১/১ পৃঃ।[5]. আদাবুল মুফরাদ হা/১১৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯১৪, ২৫৭৬, সনদ ছহীহ।[6]. আদাবুল মুফরাদ হা/১১৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৩২৭০; ছহীহাহ হা/১০৩।[7]. আদাবুল মুফরাদ হা/১১৭, সনদ ছহীহ।[8]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৪।

[9]. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৭২; আত-তারগীব হা/২৫৬৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৫০১; আদাবুল মুফরাদ হা/১০২।[10]. তিরমিযী হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৫১৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭২।[11]. মিশকাত হা/৪৯৯০, সনদ হাসান।[12]. বুখারী হা/৫৬৭২; আবু দাউদ হা/৫১৫৬।[13]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬২‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়।[14]. মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩[15]. আহমাদ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৯৯২; ছহীহ তারগীব হা/২৫৬০।[16]. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০০০; ছহীহুল জামে‘ হা/২৫৬৩, সনদ হাসান।[17]. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭, সনদ ছহীহ।[18]. আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪।[19]. বুখারী, হা/২২৫৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭-১০৮।[20]. বুখারী হা/৬০১৪-১৫; মুসলিম হা/২৬২৪।[21].আদাবুল মুফরাদ হা/১১৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৭৭৯। [22]. মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৭;আদাবুল মুফরাদ হা/১১৪।[23]. *আদাবুল* মুফরাদ হা/১২৪, সনদ ছহীহ।**[24]**. মুসলিম হা/৪৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৭০৮৬।**[25]**. মিশকাত, হা/৪৯৯১; আদাবুল মুফরাদ হা/১১২; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৯।**[26]**. মুসলিম হা/১৪৩০; মিশকাত হা/৩২১৭।**[27]**. তিরমিযী হা/৭৮০; ইবনু মাজাহ হা/১৭৫০, সনদ ছহীহ।**[28]**. মুসলিম হা/২১৬২; মিশকাত হা/১৫২৫।[29]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৬৪,‘ক্রয়-বিক্রয়’ অধ্যায়।[30]. বুখারী হা/১০; মুসলিম হা/৪০।**[31]**. আদাবুল মুফরাদ হা/১০৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫।**[32]**. মুসলিম হা/৪৬৯১।**[33]**. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৪; সনদ ছহীহ।

[34]. ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬; ছহীহ আত-তারগীব হ/২৩৩৮; ছহীহাহ হা/২৩৪১-এর আলোচনা দ্র:।[35]. বুখারী হা/৭৩৭৬; মিশকাত হা/৪৯৪৭।[36]. মুসলিম হা/৭০২৮; মিশকাত, 'কিতাবুল ইলম' হা/২০৪।[37]. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭।[38]. ছহীহুল জামে' হা/৫৭৬৯, সনদ ছহীহ।[39]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০১।[40]. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২।[41]. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩।[42]. মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪।[43]. বুখারী, মিশকাত, হা/১৫২৩।[44]. আদাবুল মুফরাদ হা/৫১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৯৮১, হাদীছ ছহীহ।[45]. মুসলিম হা/২৫৬৮; মিশকাত হা/১৫২৭।[46]. আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২, হাদীছ ছহীহ।[47]. তিরমিযী হা/২০০৮, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৫০১৫।[48]. তিরমিযী হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ।[49]. ইবনু মাজাহ হা/১৬০১, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৬৪।[50]. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৫।[51]. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৪।[52]. বুখারী হা/৪৭; মিশকাত হা/১৬৫১।[53]. ইবনু মাজাহ হা/১৬১০; আবুদাঊদ হা/৩১৩২ সনদ হাসান।[54]. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪, সনদ হাসান-ছহীহ।[55]. আদাবুল মুফরাদ হা/১২৫, সনদ হাসান-ছহীহ।[56]. আবূ দাঊদ হা/৪৯১৯, তিরমিযী হা/২৬৪০, হাদীছ ছহীহ।[57]. মুসলিম হা/১০০৯।[58]. আদাবুল মুফরাদ হা/১১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩১৮৫। (https://at-tahreek.com/)

ব্যবসা বাণিজ্যে সুন্নাহ

أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন'। (বাক্বারাহ ২৭৫)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইসলাম উপার্জনের পেশা হিসাবে হালাল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেমন উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতেও নিষেধ করেছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে সাময়িকভাবে লাভবান হওয়া গেলেও এর শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই অন্যায়, যুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, মওজুদদারী ইত্যাদি অবৈধ ও ইসলাম বিরোধী কার্যাবলী পরিহার করে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে।

নবুয়ত লাভের আগে চাচা আবু তালেবের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়িক কাজ করেছেন। এছাড়া খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার ব্যবসাও করেছেন। ব্যবসার উদ্দেশ্যে শামে সফর করেছেন। অধিকন্তু তিনি হাট-বাজারেও ব্যবসা করতেন; যেমন: মিজান্না, উকায।

এগুলো ছিল জাহেলী যুগের কিছু বাজার। ব্যবসায়ীরা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য এই বাজারগুলোতে যেত।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সরাসরি বিক্রি করতেন। যেমনটি উমর (রাঃ) এর উট ও জাবের (রাঃ) এর উটের ক্ষেত্রে ঘটেছে। কিংবা কখনো তার কোনো এক সাহাবীকে এই দায়িত্ব দিতেন। যেমন তিনি উরওয়া ইবনে আবিল জা'দ আল-বারেক্বীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বারেক্বী বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক দীনার দেন যেন সে এটি দিয়ে একটি কুরবানীর পশু কিংবা (বলেছেন) একটি বকরি কিনে আনেন। সে দুইটি বকরি কিনেছে। তারপর এক দীনারের বিনিময়ে একটি বকরি বিক্রি করে দেয়। তারপর একটি বকরি ও এক দীনার নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসে। তখন তিনি তার জন্য ব্যবসায় বরকত লাভের দোয়া করেন। এরপর থেকে সে মাটি কিনলেও তাতে লাভ করতেন।[হাদীসটি তিরমিযী (১২৫৮), আবু দাউদ (৩৩৮৪) ও ইবনে মাজাহ (২৪০২) বর্ণনা করেন এবং শাইখ আলবানী সহিহুত তিরমিযী গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদেরকে সদাচরণ, সত্যবাদিতা ও দানশীলতার নির্দেশ দিতেন।

হাকীম ইবনে হিযাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

"ক্রেতা-বিক্রেতা একে অপর হতে আলাদা না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের জন্য (ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার) স্বাধীনতা থাকে। যদি তারা সত্য বলে, পণ্যের দোষ-ক্রটি খোলাখুলিভাবে বলে তবে তাদের এই লেনদেনে বরকত দেয়া হয়। আর যদি তারা মিথ্যা দোষ-ক্রটি গোপন করে ও মিথ্যাকথা বলে তখন তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত তুলে নেয়া হয়।"[হাদীসটি বুখারী (১৯৭৩) ও মুসলিম (১৫৩২) বর্ণনা করেন]

খ. ইসমাঈল ইবনে উবাইদ ইবনে রিফা'আ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামাযের স্থানের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে দেখতে পান যে, লোকজন ক্রয়-বিক্রয় করছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়'! তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডাকে সাড়া দিয়ে গলা ও চোখ তুলে তাকাল। তিনি বললেন: "ব্যবসায়ীরা কিয়ামতের দিন পাপিষ্ঠ অবস্থায় উত্থিত হবে। কেবল সেই ব্যবসায়ী ছাড়া যে আল্লাহকে ভয় করে, সৎ থাকে ও সত্য বলে।" [হাদীসটি তিরমিযী (১২১০) ও ইবনে মাজাহ

(২১৪৬) বর্ণনা করেছেন। শাইখ আলবানী 'সহীহুত তারগীব' (১৭৮৫) গ্রন্থে হাদীসটিকে সহিহ বলে গণ্য করেছেন]

গ. কাইস ইবনে আবি গারাযা বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ক্রয়-বিক্রয়ে শপথ ও অনর্থক কথা হয়ে যায়। তাই তোমরা এর সাথে দান-সদকার মিশ্রণ করো (ক্রটিমুক্ত করো)।' [হাদীসটি তিরমিযী (১২০৮), আবু দাউদ (৩৩২৬), নাসাঈ (৩৭৯৭) ও ইবনে মাজাহ (২১৪৫) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী সহিহ আবু দাউদে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা ও সহজতার নির্দেশ দিতেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন যে ব্যক্তি বিক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত।"[হাদীসটি বুখারী (১৯৭০) বর্ণনা করেন]

ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: উক্ত হাদীসে লেনদেনে উদার হওয়া, উত্তম ব্যবহার করা ও ঝগড়াঝাটি পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এবং পাওনা আদায় করা ও মানুষের কাছ অতিরিক্ত গ্রহণ করার জন্য চাপাচাপি পরিহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। [ফাতহুল বারী (৪/৩০৭)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতার কিছু নমুনা:

ক. ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি (আমার পিতা) উমরের একটি অবাধ্য জওয়ান উটের উপর সওয়ার ছিলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। উমর তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরকে বললেন: "এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনারই। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি কর।" তখন তিনি সেটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিক্রি করে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "হে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা খুশি তা করো।"[হাদীসটি বুখারী (২৬১০) বর্ণনা করেন]

খ. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একটা উটের পিঠে সফর করছিলেন। উটটি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তখন তিনি উটটিকে ছেড়ে দিতে চাইলেন। তিনি বলেন: তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এসে আমার জন্য দুআ করলেন এবং উটটিকে প্রহার করলেন। এরপর থেকে উটটি এমন গতিতে চলতে লাগল

যেভাবে ইতঃপূর্বে চলেনি। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: "তুমি উটটি এক উকিয়াহর বিনিময়ে আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" আমি বললাম: না। অতঃপর দ্বিতীয়বার তিনি বললেন, "এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও।" ফলে আমি উটটি তাঁর কাছে এক উকিয়াহ মূল্যে বিক্রি করে দিলাম এবং বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত উটের পিঠে চড়ে যাবার শর্ত করলাম। যখন বাড়ি পৌঁছালাম তখন উটটি নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তখন তিনি সেটির মূল্য নগদে পরিশোধ করে দিলেন। অতঃপর আমি ফিরে আসছিলাম। এমন সময় তিনি আমার পেছনে লোক পাঠালেন এবং আমাকে বললেন: "তুমি কি মনে করছ যে, আমি তোমার উটটি কম মূল্য দিয়ে নিতে চাচ্ছি, তুমি তোমার উট ও দিরহামগুলো নিয়ে যাও। এ (সবই) তোমার জন্য।"[হাদীসটি বুখারী (১৯৯১) ও মুসলিম (৭১৫) বর্ণনা করেন। হাদিসটির পাঠ মুসলিমের]

তিনি অধিকারীর অধিকার উত্তমরূপে পরিশোধ করতেন এবং এভাবে পরিশোধ করতে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোনো এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিল। সে পাওয়ার জন্য আসলে তিনি সাহাবীদের বললেন: "তার পাওনা দিয়ে দাও।" তারা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু পেলেন না। কিন্তু এর থেকে বেশী বয়সের উট পেলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "সেটাই দিয়ে দাও।" তখন লোকটি বলল: "আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন; আল্লাহ আপনাকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন।" নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "যে পরিশোধ করার বেলায় উদার সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।"[হাদীসটি বুখারী (২১৮২) ও মুসলিম (১৬০১) বর্ণনা করেন]

যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের পর আফসোস করে তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উৎসাহ দিতেন।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে চুক্তি বাতিল করার সুযোগ দিবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দিবেন।"[হাদীসটি আবু দাউদ (৩৪৬০) ও ইবনে মাজাহ (২১৯৯) বর্ণনা করেন। শাইখ আলবানী 'সহিহ আবু দাউদ' গ্রন্থে এটিকে সহিহ বলে গণ্য করেন]

চুক্তিভঙ্গ করতে দেয়া মানে: উদার হওয়া, ক্রয়-বিক্রয় থেকে রুজু করা। এটি বড় মনের পরিচায়ক।

‘ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি ভঙ্গের উদাহরণ হচ্ছে: যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কারো থেকে কোনো কিছু ক্রয় করার পর আফসোস করে; এতে ঠকে যাওয়া প্রকাশ হওয়া কিংবা তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া কিংবা তার কাছে পয়সা না থাকার কারণে; তারপর সে পণ্যটি বিক্রেতার কাছে ফেরত দেয়, আর বিক্রেতা তার ফিরিয়ে দেওয়া পণ্য গ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন ঐ বিক্রেতার ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দিবেন ও তার কষ্ট দূর করে দিবেন। কারণ সে ক্রেতার প্রতি দয়া করেছে, যেহেতু বিক্রয় ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল এবং ক্রেতার জন্য তা বাতিল করা সম্ভব ছিল না।’[সমাপ্ত][আউনুল মা’বূদ]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রয় করার সময় দর-দাম করতেন। তবে মানুষের পণ্যের মূল্য কম দিতেন না। যেমনটি ইতঃপূর্বে জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহুর উটের হাদীসে আমরা দেখেছি।

সুয়াইদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন: আমি ও মাখরামা আল-আব্দী ‘হাজার’ নামক স্থান থেকে কিছু কাপড় মক্কায় আমদানি করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে কিছু পায়জামা দামাদামি করলেন এবং আমরা তার কাছে পায়জামা বিক্রি করলাম।[হাদীসটি তিরমিযী (১৩০৫) বর্ণনা করেন এবং বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। আবু দাউদ (৩৩৩৬), নাসাঈ (৪৫৯২), ইবনে মাজাহ (২২২) বর্ণনা করেন]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওজনে কিছুটা বেশি দেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

সুয়াইদ ইবনে কাইস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ওজন করতে দেখে তাকে বললেন: “ওজন করো এবং একটু বেশি দাও।”[এটি পূর্বের হাদীসের অবশিষ্ট অংশ]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থকষ্টে থাকা ব্যক্তিকে সময় দেওয়া এবং তার থেকে পাওনা মাফ করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন।

আবুল ইউসর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ

“যে ব্যক্তি অর্থকষ্টে থাকা ব্যক্তিকে সময় দিবে বা পাওনা মাফ করে দিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা’আলা তাকে নিজের আরশের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করবেন।”[হাদীসটি মুসলিম (৩০০৬) বর্ণনা করেন]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদী লেনদেন, প্রতারণাপূর্ণ বিক্রি, ঈনা (কোনো বস্তু বাকিতে বিক্রি করার পর পুনরায় ক্রেতার কাছ থেকে নগদে কম মূল্যে ক্রয় করা) পদ্ধতিতে বিক্রি, হারাম বস্তু দিয়ে ব্যবসা করা, ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করতে নিষেধ করেছেন।

ইসলাম মানুষকে কোনো ক্ষেত্রেই বল্গাহীন স্বাধীনতা দেয় নি। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা। আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ইসলামের দু'টি মূলনীতি রয়েছে।

এক- ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও কায়কারবারগুলো বৈধ হতে হবে। অবৈধ পণ্যের ব্যবসা ও অবৈধ কায়কারবারকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। যেমন, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হওয়া ইসলামে অনুমোদন নেই। কারণ, এসব বিষয়কে ইসলামে মৌলিকভাবেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আপনার ব্যবসার সাথে এসবের সংমিশ্রণ আপনার ব্যবসাকে কলুষিত করে।

দুই- ব্যবসা-বাণিজ্য সকল অবস্থায় বৈধ পন্থায় হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি, ভেজাল ও ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। কোনো ধরনের মিথ্যার আশ্রয় থাকতে পারবে না।

ব্যবসা দ্বারা মানুষের উপকার করার মানসিকতা থাকতে হবে। কারো ক্ষতি যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দেন যে,

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

"নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়"[1]

ব্যবসা করে গ্রাহকের কাছ থেকে আমরা শুধু লাভ করছি তা নয়; বরং আমরা তাদের জিনিস ও সেবা প্রদান করছি। যদি আমরা যৌক্তিক লাভ করে থাকি এবং মনোপলি না করি তবে সমাজের জন্য এটি একটি বড় সহায়তা। ভালো জিনিস যৌক্তিক দামে প্রদান করায় সমাজের মানুষ সন্তুষ্ট হবে, তাতে আল্লাহ তা'আলাও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। যখন ব্যবসায়ী ও গ্রাহক উভয় পক্ষ অনুভব করবে আমরা উপকৃত হয়েছি তখন সেখানে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে। যা একটি সুগঠিত সমাজের জন্য প্রয়োজন। এতে উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সাওয়াব পাবেন।

(ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩৪১)

ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করা যাবে না-এ ধরনের অপকর্ম ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত। মন্দ জিনিস ভালো বলে চালিয়ে দেওয়া, ভালোর সঙ্গে মন্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

“একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গিয়ে একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি খাদ্যের ভিতরে হাত প্রবেশ করে দেখলেন ভিতরের খাদ্যগুলো ভিজা বা নিম্নমান। এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাবারের পন্যের মালিক এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল, এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেটাকে খাবারের উপরে রাখলে না কেন; যাতে লোকেরা দেখতে পেত? “যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়”।[1] (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০২)

ওজনে নিজ স্বার্থরক্ষায় কমবেশি করা যাবে না-

অন্যকে দেওয়ার সময় ওজনে কম দেওয়া আর নেওয়ার সময় বেশি করে নেওয়া জঘন্য অপরাধ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣﴾ [المطففين: ١، ٣]

“ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়”। [সূরা আল-মুতাফফিফীন, আয়াত: ১-৩]

সুতরাং তুমি যখন কাউকে দেবে তখন কম দেবে না। তুমি যে কাজটি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো না, তা অন্যের জন্য কীভাবে পছন্দ কর। তুমি যখন নিজের জন্য নাও তখনতো তোমাকে মাপে কম দিলে তুমি রাজি হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

“তুমি তোমার নিজের জন্য যা ভালোবাসো তা অন্যের জন্যও ভালোবাসার আগ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না”।[1]

শু‘আইব আলাইহিস সালাম যে নীতি বর্ণনা করেন, কুরআন তা তুলে ধরছেন এভাবে:

﴿وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَٰهٍ غَيۡرُهُۥۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَۖ ٨٤﴾ [هود: ٨٤]

“হে আমার কাওম! আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো মা‘বুদ নাই। আর পরিমাপে ও ওজনে কম দিও না”। [সূরা সূরা হূদ, আয়াত: ৮৪]

﴿وَيَٰقَوۡمِ أَوۡفُواْ ٱلۡمِكۡيَالَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ ٨٥﴾ [هود: ٨٥]

“আর হে আমার জাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ কর ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনোরূপ ক্ষতি করো না”। [সূরা হূদ, আয়াত: ৮৫]

অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ إِذَا كِلۡتُمۡ وَزِنُواْ بِٱلۡقِسۡطَاسِ ٱلۡمُسۡتَقِيمِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلٗا ٣٥﴾ [الاسراء: ٣٥]

"মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে। এটি উত্তম, এর পরিণাম শুভ"। [সূরা বনী ঈসরাইল, আয়াত: ৩৫]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "...যখন কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরা ওজনে বা মাপে কম দেয়, তখন শাস্তিস্বরূপ তাদের খাদ্য-শস্য উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে"।[2]

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে, "...যে জাতি মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের রিযিক উঠিয়ে নেওয়া হয়..."।[3] মনে রাখতে হবে, সালাত, সাওম ইত্যাদি নেক আমলে ক্রটি হলে আল্লাহ তা'আলা হয়তো তা তার নিজের অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন; কিন্তু মানুষকে সামান্য অণু পরিমাণ ঠকানো হলে বা অণু পরিমাণ মানুষের হক নষ্ট করলে, এ দায়ভার কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা নিবেন না। কিয়ামতের দিন প্রতারিত ক্রেতাকে ডেকে আল্লাহ তা'আলা ওই প্রতারকের আমলনামা থেকে সমপরিমাণ সাওয়াব তাকে দিয়ে দেবেন। প্রতারকের সাওয়াব যদি শেষ হয়ে যায় বা কোন সাওয়াব না থাকে, তবে প্রতারিতদের গোনাহ তাঁর কাঁধের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন কাঁদতে কাঁদতে যদি শরীরের প্রতিটি লোমকূপ থেকে রক্তও প্রবাহিত হতে থাকে, তাতেও কোন কাজ হবে না। সেদিন এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কোনক্রমেই ক্ষমা করবে না, যদি প্রতারিত ব্যক্তি তাকে ক্ষমা না করেন।

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩

[2] আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হাদীস নং ৭৮৫

[3] মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ৫৩৭০

পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ করা যাবে না-

মিথ্যা মানবতাবোধকে লোপ করে, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ঘটায়। মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর অভিশাপ। মিথ্যা বলে বা মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রি করার পরিণতি খুবই ভয়াবহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ».

“কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তিন ব্যক্তির সাথে কোনো ধরনের কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন- যে তার ব্যবসায়িক পণ্যকে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করে”।[1]

অপর একটি হাদীসে এ দৃষ্টান্ত এভাবে তুলে ধরা হয়েছে-

«رجل حلف على سلعة بعد العصر، لقد أعطي بها كذا، وكذا، فصدقه المشتري وهو كاذب».

“এক ব্যক্তি আসরের পর তার পণ্য সম্পর্কে কসম খেয়ে বলে, তাকে পণ্যটি এত এত মূল্যে দেওয়া হয়েছে। তার কথা ক্রেতা বিশ্বাস করল, অথচ সে মিথ্যুক”।[2] এ ধরনের ব্যবসায়ীর জন্য উল্লিখিত হাদীসে অত্যন্ত কঠিন ও বেদনাদায়ক শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০৬

[2] আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৪৭৪; নাসায়ী, হাদীস নং ৪৪৬২

নিজে ঠকা যাবে না এবং অপরকেও ঠকানো যাবে না-

এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করল, যে সে বেচা-কেনাতে প্রতারিত হয় বা ঠকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ».

“যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন তুমি বলে দিবে যে কোনো প্রতারণা বা ঠকানোর দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার জন্য তিনদিন পর্যন্ত পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার রয়েছে”।[1]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯৬৪

ব্যবসার সাথে সুদকে মেশানো যাবে না-

সুদ একটি মারাত্মক অপরাধ। সুদ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। ব্যবসার নামে কোন প্রকার সুদ চালু করা যাবে না। সুদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ٢٧٥﴾ [البقرة: ٢٧٥]

“যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে শয়তানের আসরে মোহাবিষ্টদের মতো। কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) ওতো সুদের মতো, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৫]

আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِۗ ٢٧٦﴾ [البقرة: ٢٧٦]

“আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খায়রাতকে বর্ধিত করেন”। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৭৬]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ».

"সুদ যদিও বৃদ্ধি পায় কিন্তু এর শেষ পরিণতি হচ্ছে স্বল্পতা"।[1]

লেনদেন যদি সুদ সংক্রান্ত হয় তবে হাদীসে এসেছে, জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন যে,

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».

"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, হিসাবকারী এবং সাক্ষী সকলের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেন তারা সকলেই সমান"।[2]

[1] ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২২৭৯

[2] সহীহ মুসলিম নং ১৫৯৮

অনুমান ভিত্তিক ব্যবসা করা হতে বিরত থাকা-

বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ হতে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে মুযাবানা বলে। বিভিন্ন ধরণের মুযাবানা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। ক্ষেতে অকীর্তিত খাদ্য শস্য যথা গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা, গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে মুহাকালা বলে। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন।[1]

[1] ইবন কাসীর

অপরের মাল হনন করার চেষ্টা করা যাবে না-

ব্যবসার জটিল মারপ্যাঁচে অন্যের মাল হরণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ ٢٩﴾ [النساء : ٢٩]

"হে ঈমানদারগন তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ"। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ২৯]

হাদীসে এসেছে একটি ব্যবসায়িক লেনদেনে উভয় পক্ষই খুঁতসহ পণ্যেও সঠিক বর্ণনা দিতে হবে। ইসলামের বিজনেস কন্ডাক্ট সম্পর্কে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এভাবে বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى».

"আল্লাহ তার প্রতি দয়া বর্ষণ করুক যে বিক্রির সময়, ক্রয়ের সময় এবং অভিযোগের সময় সদয় থাকে"।[1]

[1] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৭৬

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহঃ

ইসলামী আদর্শই আসলে মানব সমাজকে পশুত্ব ও পাশবিকতামুক্ত একটি সুসভ্য ও মার্জিত পরিশিলীত সমাজে পরিণত করতে পারে। যুগে যুগে আগত নবী-রাসূলগণের এবং তাদের সাথে আগত আসমানী কিতাব ও সহীফার শিক্ষার ফলেই মানুষ সভ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছে এবং পশু প্রাণীর চেয়ে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হতে সক্ষম হয়েছে। কথায় বলে নদী মরে গেলেও রেখা থাকে। বিশ্বের এমন কোনো স্থান নেই বা এমন কোনো জাতি গোষ্ঠী নেই যাদের কাছে কোনো না কোনো সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নবী বা রাসূলই আসেননি। নবী এবং রাসূল মানুষকে সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাতের মর্যাদায় ভূষিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবশ্যই এসেছেন। মানুষ পরবর্তী পর্যায়ে তাদের শিক্ষা থেকে বিপথগামী হয়েছে। এরপরও আজকের বিশ্বে মানবতা মনুষত্বের ন্যায় ও সত্যের যতটুকু শিক্ষা বেঁচে আছে, তা বিভিন্ন সময়ে আগত নবী-রাসূলদের শিক্ষারই ধারাবাহিকতা। যার পরিপূর্ণতা ও স্বার্থক বাস্তবায়ন হয়েছে আল্লাহর সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ কিতাবের মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বোচ্চ বিধি বিধানসহ সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়সমূহকেও তাই পরিমার্জিতভাবে আনজাম দেয়ার জন্য আল্লাহর নির্দেশ রয়েছে। আর সে নির্দেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাসূল সা. বাস্তব প্রশিক্ষকের (Practical demonestator) ভূমিকা পালন করে গেছেন। মানুষের জীবন ধারণের জন্য খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ অপরিহার্য। এক্ষেত্রে যেমন হালাল হারাম বা বৈধ অবৈধতার বিষয়টি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় তেমনি খানাপিনার ক্ষেত্রে কিছু নিয়মপদ্ধতি মেনে চলাও অপরিহার্য।

এক্ষেত্রে কুরআন থেকে ছোট দুটি আয়াত আমরা সামনে রাখতে পারি। সূরা বাকারার ৬০ আয়াতে আল্লাহ বলেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

“আল্লাহর দেয়া রিযিক থেকে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর। দুনিয়াতে ফাসাদ বা বিবাদ বিসম্বাদ সৃষ্টিকারী হয়ো না।”

সূরা আ’রাফের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

“খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ কর কিন্তু অপচয় কর না।”

এখানে একটি আয়াতে ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি না করে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের তাকিদের মধ্যে পরোক্ষভাবে যে শিক্ষাটি পাই তাহলো এ নিয়ে যেন মানুষের সমাজে কোনো অঘটন না ঘটে।

পরবর্তী আয়াতে প্রয়োজনীয় খাবার ও পানীয় গ্রহণের নির্দেশের সাথে অপচয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর বিষয়টি খুবই প্রণিধানযোগ্য। একদিকে সমাজের কিছু ব্যক্তির হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী থাকার কারণে তারা বঞ্চিতদের প্রয়োজন পূরণে কার্পণ্য প্রদর্শন করলেও অপচয় করতে মোটেও দ্বিধা করে না। এমনি অনেক দেশে তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও অপেক্ষাকৃত গরীব ও পিছিয়ে পড়া দেশের অভুক্ত মানুষের খাবারের চাহিদা পূরণের পরিবর্তে বাজার ধরার জন্য অপচয়ও করে আবার খাদ্য নিয়ে নোংরা রাজনীতি করে থাকে। আল কুরআনের নির্দেশনা এদের সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ব্যক্তিগতভাবে হোক আর এক সাথে অনেকে মিলে হোক খাবারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের পছন্দনীয় কিছু নিয়ম নীতি আছে যা অনুসরণ করলে মানুষের সমাজে একটি মার্জিত ও রুচিসম্মত আচার-আচরণ গড়ে উঠতে পারে। আমরা এক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর কয়েকটি হাদীস থেকে দিক নির্দেশনা নেয়ার চেষ্টা করব।

হযরত ওমর বিন আবি সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শৈশবে রাসূল পাক সা.-এর ঘরে তাঁর প্রত্যক্ষ দেখা শোনায় মানুষ হয়েছি। একদিন আমার হাত দু'টি একটি খাবারের থালায় (খাবার) নাড়াচাড়া করছিল। রাসূল সা. দেখে বললেন, হে বৎস! বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করো। ডান হাত দিয়ে খাও, খাবার পাত্রের তোমার কাছের দিক থেকে খাবার গ্রহণ কর।" হাদীসটি বুখারী এবং মুসলিম দু'টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে আমরা খাবারের আদব প্রসঙ্গে তিনটি শিক্ষা পাই। এক আল্লাহর নাম নিয়ে অর্থাৎ বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করতে হবে। দুই: ডান হাত দিয়ে খেতে হবে। তিন: খাবারের পাত্রের যত্রতত্র থেকে খাবার না নিয়ে নিজের নিকট থেকে এবং নিজের নিকটের পাশ থেকে খাবার গ্রহণ করতে হবে। এখানে নিজের খাবারের পাত্র থেকে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি একইভাবে এক সাথে অনেকে মিলে খাবার গ্রহণের সময় সকলের জন্য বা একসাথে কয়েকজনের জন্য রাখা পাত্র থেকে খাবার নিজের পাত্রে নেয়ার সময়ও এ নিয়মটাই অনুসরণ করতে হবে। এটা যেমন সকলের প্রতি সম্মানবোধ ও বিবেচনা বোধের পরিচয় বহন করে, তেমনি মার্জিত, পরিশিলীত ও ভদ্রজনিত ব্যবহারেরই প্রতিফলন ঘটায়। পক্ষান্তরে এর বিপরীত হলে সেটা অন্যের মনে বিরক্তিকর ভাবের সৃষ্টি করতে পারে। একত্রে সংরক্ষিত বা সাজানো খাবারের সৌন্দর্য সৌকর্যও নষ্ট করতে পারে।

আর ডান হাতে খাওয়াটাই মানব প্রকৃতির কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য এবং রুচিসম্মত তথা বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্য সম্মতও হওয়ার কথা। কারণ মানুষের বাম হাতের ব্যবহার সাধারণত যে কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেটা সকলের জানা। এরপর পাশ্চাত্যে কেন বাম হাতের

ব্যবহার হয়ে আসছে খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা মোটেই বোধগম্য নয়। আল্লাহ ও রাসূল সা. প্রদর্শিত শিক্ষার বিপরীত করাটাই যদি তাদের সভ্যতার দাবি হয়ে থাকে তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের বলার কিছুই নেই। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, মুসলিম নামধারী সোস্যাল এ্যালিটদের মধ্যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারীদেরও আমরা হাদীসে রাসূল নির্দেশনার বিপরীত আচরণ দেখে বিস্মিত হই। তারা বিভিন্ন পার্টিতে বাম হাতে খাবার গ্রহণ করে নিজেদের প্রগতিশীল প্রমাণের প্রয়াস চালানোর এই কুরুচীপূর্ণ আচরণ দুঃখজনক।
হযরত আনাস রা. বর্ণিত হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীসগ্রন্থে এভাবে উল্লেখিত হয়েছে: রাসূল সা.-এর খেদমতে কিছু পরিমাণ দুধ পেশ করা হলো, পরিমাণে কম থাকায় তাতে কিছু পানি মিশানো হলো, (কারণ রাসূলের একার জন্য আনা হয়েছিল, অথচ তাঁর পাশে আরো দু'জন ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলের ডান পাশে বসা ছিলো একজন বেদুঈন এবং বাম পাশে বসা ছিলেন হযরত আবু বকর রা.। আধুনিক প্রোটোকল অনুসরণ করলে, সামাজিক মান মর্যাদা অনুযায়ী রাসূল সা.-এর পরে হযরত আবু বকরকে উক্ত দুধ পানের জন্য অগ্রাধিকার দেয়ার কথা। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সা. তার ডান দিকে বসা বেদুঈনকে আগে দিলেন এবং হযরত আবু বকর রা.-কে পরে দিলেন। যেহেতু তিনি বাম দিকে ছিলেন। আর ইসলামী সংস্কৃতির দাবি হলো সবকিছুই ডান দিক থেকে শুরু করা। এখানে রাসূল সা.বেদুঈনকে অগ্রাধিকার দিয়ে কারণটাও উল্লেখ করলেন যে,ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. উটের মতো এক নিঃশ্বাসে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন, বরং দুই বারে অথবা তিনবারে পানি পান করতে বলেছেন। সেই সাথে এটাও বলেছেন, বিসমিল্লাহ বলে পানি পান শুরু করবে, আর শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ পড়বে। হাদীসটি তিরমিযি শরীফে উল্লেখিত হয়েছে।
খাবারের ক্ষেত্রে তিরমিযি শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং অধিকতর স্বাস্থ্যসম্মতঃ "আবি কারামাল মেকদাম ইবনে মা'দিকারাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছিঃ "আদম সন্তান যেন উদর পূর্তি করে খাবার গ্রহণ না করে, ক্ষুধা নিবৃতির জন্য যতোটুকু নূন্যতম প্রয়োজন তাই যথেষ্ট মনে করে। তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য, বাকী শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে।"
ইবনে মাজায় বর্ণিত একটি হাদীসে অপচয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল সা.বলেছেন, যা কিছু খেতে মন চায় বা মনে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, অবলিলাক্রমে তাই গ্রহণ করাটাই অপচয়ের শামিল।

খাদ্য ও পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেয়াকে আল্লাহর রাসূল সা. নিষেধ করেছেন, রাসূল সা.-এর এই নিষেধটি খুবই বিজ্ঞানসম্মত এবং স্বাস্থ্যসম্মত।

হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, যখন রাতের খাবারের আয়োজন করা হয় আর সে সময়ই যদি ইশার নামাযের সময় উপস্থিত হয়,তাহলে আগে রাতের খাবার খেয়ে তারপর ইশার নামায আদায় করতে হবে।

সামষ্টিকভাবে খাবারের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সা.-এর যে সৌজন্যমূলক আচরণের তাকিদ তাও একটি রুচিশীল সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। ইবনে মাজা হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যখন খাবারের জন্য দস্তরখান বিছানো হয় এবং তাতে খাদ্য সাজানো হয় সেই খাবার মজলিসে অংশগ্রহণকারী কেউ দস্তরখানা (খাবার শেষে) না উঠানো পর্যন্ত কারও উঠা উচিত নয়। আর নিজের খাবার শেষ হলেও অন্যদের খাবার শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিজের খাবারের পাত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেবে না। নেহায়েত প্রয়োজনে উঠতে হলে ওজর পেশ করে নিতে হবে। কারণ মজলিসে কোনো কোনো ব্যক্তির আগে আগে খাবার শেষ হবার কারণে অন্যরা অপমানিত বোধ করতে পারে। হয়তোবা কারো কারো খাবারের চাহিদা থেকেও যেতে পারে।

খাবার শেষের দোআ সম্পর্কে আমাদের সকলের জানা থাকার কথা। যা মূলত আল্লাহর শোকর গোজার বান্দা হবার এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধির সহায়ক।

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, যখন কোনো ব্যক্তি (দিনের কাজ শেষে বা অন্য কোনো স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করত) নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করে প্রবেশকালে এবং খাবারের সময়ে, তখন শয়তান তার সাথী-সঙ্গিদেরকে বলে, এ বাড়ীতে তোমাদের রাত যাপনেরও সুযোগ নেই। রাতের খাবারে শরীক হওয়ারও কোনো সুযোগ নেই। আর যদি এর বিপরীতে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, শয়তান তার সাথীদের বলে, এ বাড়ীতে রাত যাপনের সুযোগ হলো এবং খাবারের সময় যদি আল্লাহর নাম উচ্চারণ না করে তাহলে শয়তান তার সাথীদের ডেকে বলে, এ বাড়ীতে রাতের খাবারে অংশ গ্রহণেরও সুযোগ পেলে।" (মুসলিম শরীফ)

ঈমানদারের দিনরাত এবং চলাফেরা সবসময় আল্লাহর যিকিরে থাকার উপরে মূলত তাকিদ দেয়ার জন্যই রাসূল এই নির্দেশটি দিয়েছেন। দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যে আল্লাহকে স্মরণ রেখে চলাও ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা সূরা জুমআয় এক পর্যায়ে বলেন, "নামায শেষে আল্লাহর যমীনে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করো, অর্থাৎ হালাল জিবিকা অর্জনের চেষ্টা করো, আর বেশী বেশী করে আল্লাহর যিকির করো।" এই যিকির আনুষ্ঠানিক বা সার্বক্ষণিক যিকির। যার প্রক্রিয়া আল্লাহর প্রিয় রাসূল সা. আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন।

পোশাক পরিচ্ছদের সুন্নাহ

যে পোশাক ছতর ঢাকে, গরম ও শীত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং ক্ষতি নিবারণ করে, সে পোশাক ওয়াজিব। হাকিম ইবনে হিযামের পিতা বলেন, আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্! আমাদের ছতরের কতটুকু ঢাকবো এবং কতটুকু ঢাকবোনা? তিনি বললেন: তোমার স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত আর সবার সামনে পুরো ছতর ঢাকবে। আমি বললাম: হে রসূলুল্লাহ্, যখন সবাই এক জায়গায় অবস্থান করে তখন? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন: যদি পার, কাউকেই ছতর দেখতে দেবেনা। আমি বললাম: আমাদের কেউ যদি একাকী থাকি? তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি লজ্জা পাওয়া উচিত।' (আহমদ, আবুদাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযি, হাকেম। তিরমিযি ও হাকেম একে হাসান বলেছেন)।

যে পোশাকে সৌন্দর্য আছে, তা মুস্তাহাব পোশাক। আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন; 'তোমরা তোমাদের ভাইদের সামনে উপস্থিত হয়ে থাক। সুতরাং তোমাদের আবাসস্থল ও তোমাদের পোশাককে সুন্দর পরিচ্ছন্ন কর, যাতে তোমরা জনগণের মধ্যে অভিজাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পার। (মনে রেখ) আল্লাহ্ অশালীন ও অশালঅনতাকে পছন্দ করেন না।' (আবু দাউদ)।

হারাম পোশাক হলো পুরুষের জন্য রেশমের পোশাক, স্বর্ণ এবং মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পোশাক পুরুষরা পরা, আর মহিলাদের পুরুষদের জন্য নির্ধাররিত পোশাক পরা এবং খ্যাতি, বড়াই ও অপব্যয়মূলক পোশাক পরা।

আবুল আহওয়াসের পিতা বলেন: আমি নিম্নমানের পোশাক পরে রসূলুল্লাহ্ (সা) এর কাছে উপস্থিত হলাম। তা দেখে তিনি বললেন: তোমার কি কিছু ধন-সম্পদ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন: কী ধরনের সম্পদ। আমি বললাম: আল্লাহ্ আমাকে উট, ভেড়া, ঘোড়া ও দাসদাসী দিয়েছেন। তিনি বললেন: তাহলে আল্লাহ যখন তোমাকে ধনসম্পদ দিয়েছেন, তখন তোমার বেশ-ভূষায় আল্লাহ্র নিয়ামতের নিদর্শন ও মর্যাদা প্রকাশ পাওয়া উচিত।' (আবুদাউদ)।

বিভিন্ন ইবাদাতের সময়, জুমুআ, দু ঈদ ও জনসমাবেশের স্থানগুলোতে এর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়।

মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন; 'তোমাদের কেউ সমর্থ হলে সে যেন তার পেশাগত কাজে ব্যবহৃত পোশাক ব্যতীত জুমুয়ার দিনের জন্য এক জোড়া পোশাক তৈরি করে।' (আবু দাউদ)।

পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও আল্লাহর নির্দেশনা এবং তার রসূলের নির্দেশনা মেনে চলার উপর মানুষের সামাজ ও সভ্যতার সৌন্দর্য ও সৌকর্য বৃদ্ধি পায়। আর এটা লংঘিত হলে সভ্যতা-সংস্কৃতির নামে, প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার নামে সামাজিক অনাচার-কদাচার-দুরাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটবে বরং বাস্তবে ঘটেও থাকে।

ইসলামী জীবন বিধান মানুষের স্বভাব ধর্ম হিসেবেই অধিকতর পরিচিত। মানুষের সহজাত প্রবৃদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতির সাথে এর রয়েছে একটি সুন্দর সমন্বয় ও সাজুয্য। ইসলামে পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে প্রথম বিবেচ্য বিষয় মানুষের লজ্জা নিবারণের নূন্যতম ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। লজ্জা নিবারণের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য এবং নারীদের জন্য প্রাকৃতিক গঠন প্রণালীর দৃষ্টিতেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেয়া হয়েছে। সকল কৃত্রিমতা পরিহার করে পুরুষ ও নারী উভয়কেই একে মানতে হবে।

পোশাকের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় মানুষের সৌন্দর্য বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি এমনভাবে যেন তাকে ভদ্র সমাজে একজন মার্জিত রুচিবান মানুষ হিসেবেই মনে করা হয়। কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে অতিভদ্র সাজারও কোনো প্রয়োজন নেই। আবার কৃত্রিমভাবে নিজেকে ফকির দরবেশ হিসেবে মানুষের কাছে উপস্থাপনও গ্রহণযোগ্য নয়। সর্বোপরি কথা পোশাক পরিচ্ছদের ঈমানদারী বা তাকওয়া পরহেজগারীর একটা স্বাভাবিক ছাপ থাকতে হবে। যা সকল প্রকারের কৃত্রিমতা এবং অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত হতে হবে। এ সম্পর্কে সূরা আরাফের ২৬ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন:

يبني أدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيْشًا طَ وَلِبَاسُ التقوى لا ذَلِكَ خَيْرٌ طَ ذَلِكَ مِنْ آيَتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ –

“হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য এমন পোশাক সামগ্রির ব্যবস্থা করে দিয়েছি যা যুগপতভাবে তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে থাকে। সেই সাথে ব্যবস্থা করে

তাকওয়ার পোশাক (কলুষমুক্ত চারিত্রিক ভূষণ) যা সর্বোত্তম। এসব আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অংশ বিশেষ যাতে করে এরা আল্লাহকে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয়। (সূরা আল আ'রাফ: ২৬)

সেই সাথে সূরা আ'রাফেরই ৩১ আয়াতটিও লক্ষণীয়। আল্লাহ বলেনঃ

يبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ –

“হে আদম সন্তান! মসজিদে (নামায উপলক্ষে) প্রত্যেকবার হাজিরা দেয়ার সময় অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরিধান করে হাজির হবে।”

আমরা সাধারণত অফিস আদালতে বা যার যার কর্মক্ষেত্রে যাবার সময় সাধারণ ব্যবহার্য পোশাক রেখে অপেক্ষাকৃত সুন্দর পোশাক পরিধান করেই অভ্যস্ত। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানাদীতে যেতেও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি, কোনো উপরস্থ কর্মকর্তা বা

সম্মানিত ব্যক্তির সাথে দেখা সাক্ষাতের সময়েও এর ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু অনেককেই দেখা যায় নামাযের সময় এ দিকটাকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অথচ নামাযের মাধ্যমে মসজিদে উপস্থিতি ঈমানদার মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সুমহান ক্ষমতার অধিপতি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়াকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়ার কথা।

এ ব্যাপারে আমরা প্রিয় নবী সা. এর কয়েকটি হাদীসকে সামনে রাখলে বিষয়টির গুরুত্ব আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি:

ছয়টি সহীহ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ নাসায়ী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। "একদা এক ব্যক্তি রসূল সা.-এর দরবারে উপস্থিত হলো, তার পরনে ছিলো একটি মাত্র কাপড়। রসূল সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার কি ধন-সম্পদ আছে? ব্যক্তি উত্তরে বললো, হ্যাঁ আছে। রসূল সা. আবার প্রশ্ন করলেন, কেমন সম্পদ? উক্ত ব্যক্তি উত্তরে বললো "আল্লাহ আমাকে সব ধরনের ধন-সম্পদ দান করেছেন।" রসূল সা. অতঃপর বললেন, আল্লাহ যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তখন তোমার উপর উক্ত নেয়ামতের এবং প্রদত্ত সম্মানের প্রকাশ ও প্রতিফলনও হওয়া উচিত।

আবু দাউদ শরীফের একটি হাদীসে আল্লাহর রসূল সা. প্রশ্ন আকারে বলেছেন," তোমাদের যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন তার জন্য জুমআর দিনে দৈনন্দিন কাজে কর্মে ব্যবহৃত কাপড়ের পরিবর্তে দুই কাপড় ব্যবহার করা কি কোনো কঠিন ব্যাপার? অবশ্য পুরুষের জন্য রেশমের তৈরী পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। তেমনি সোনা রূপার অলংকার ব্যবহার থেকে পুরুষদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো কেবল নারীদের জন্য বৈধ।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন," রসূল সা. বলেছেন, তোমরা রেশমের পোশাক ব্যবহার করো না, সন্দেহ নেই যারা দুনিয়ায় এটা ব্যবহার করবে তারা আখেরাতে এ থেকে বিরত থাকবে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রসূল সা.- কে দেখলাম তিনি এক হাতে (ডান) রেশম এবং অপর হাতে (বাম) স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ দুটি জিনিস আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।" (আবু দাউদ)

তিরমিযী শরীফে হযরত আবু মূসা আশয়ারী বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রসূল সা. বলেছেন, "রেশম এবং স্বর্ণের ব্যবহার আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"

ঘুমানোর সুন্নাহ- প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘুমানোর আগে কিছু সুন্নত আমল ও দোয়া শিখিয়ে গেছেন, যা আমাদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায় করে তোলে। এই আমলগুলো শুধুমাত্র নিরাপত্তা ও

শান্তির জন্য নয়, বরং পরকালের সঞ্চয় হিসেবেও কাজ করে। তাই, ঘুমানোর আগে কিছু সময় নিয়ে যদি আমরা এই আমলগুলো পালন করি, তাহলে আমাদের রাত শুধু বিশ্রাম নয়, বরং ইবাদতের অংশে পরিণত হবে।

১. ঘুমানোর সুন্নত দোয়া পড়া

নবী ﷺ ঘুমানোর আগে বিশেষ কিছু দোয়া পড়তেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো:

اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আমার প্রাণ তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, আমার সব কাজ তোমার উপর ছেড়ে দিলাম, আমার মুখ তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার পিঠ তোমার কাছে সমর্পণ করলাম, তোমার প্রতি আশা ও ভয় নিয়ে। তোমার শাস্তি থেকে বাঁচার কোনো জায়গা নেই এবং তোমার আযাব থেকে রক্ষার কোনো স্থান নেই, কেবল তোমার কাছেই। আমি তোমার সেই কিতাবে (কুরআন) বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার সেই নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, যাকে তুমি পাঠিয়েছ।" (সহিহ বুখারি: ২৪৭)

২. আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া বলা

اللهم بسمك أموت وأحيا

অর্থ: "হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মারা যাই এবং তোমার নামে জীবিত হই।" (সহিহ বুখারি: ৬৩২৪)

৩. আয়াতুল কুরসি পড়া

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঘুমানোর আগে আয়াতুল কুরসি পড়বে, সে রাতে আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকবে এবং শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।" (সহিহ বুখারি: ৩২৭৫)

৪. সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস তিনবার করে পড়া

হাদিস:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

বাংলা অনুবাদ: আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— "রাসুলুল্লাহ ﷺ রাতে ঘুমানোর সময় তাঁর দুই হাত একত্র করতেন, তাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পাঠ করতেন। তারপর হাত দিয়ে শরীরের যেখানে পৌঁছাতে পারতেন সেখানে মুছতেন। এটি তিনি তিনবার করতেন।"

হাদিস নাম্বার:

- সহিহ বুখারি: ৫০১৭)

৫. সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়া

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল-হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য নিরাপত্তা দেবেন এবং শয়তান তার কাছ থেকে দূরে থাকবে।" (সুনান আবু দাউদ: ৪২৭৩)

৬. সূরা আল-মুলক পড়া

নবী ﷺ বলেছেন, "সূরা আল-মুলক কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা করে।" *(ইবনে মাজাহ: ৩৮৪৬)*

৭. সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে সূরা আল-বাকারার শেষ দুই আয়াত (আমানার রাসুলু) পড়বে, তা তার জন্য রাত্রে পর্যাপ্ত হবে।" *(সহিহ বুখারি: ৪০০৮, সহিহ মুসলিম: ৮০৭)*

৮. তাসবিহ ও যিকির পড়া

নবী ﷺ ফাতিমা (রা.) কে ঘুমানোর আগে নিম্নের তাসবিহ পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন:

- **৩৩ বার:** "সুবহানাল্লাহ" (سبحان الله)
- **৩৩ বার:** "আলহামদুলিল্লাহ" (الحمد لله)
- **৩৪ বার:** "আল্লাহু আকবার" (الله أكبر)

🕮 *(সহিহ বুখারি: ৩১১৩, সহিহ মুসলিম: ২৭২৭)*

৯. ওজু করে ঘুমানো

নবী ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র অবস্থায় ঘুমায়, রাতে যখনই সে জাগে এবং আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, তা কবুল হয়।" *(সুনান আবু দাউদ: ৫০৪২)*

১০. ডান কাতে শোয়া

নবী ﷺ ডান কাতে শুতে পছন্দ করতেন এবং সাহাবাদেরকেও এভাবে শোয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। *(সহিহ বুখারি: ২৪৭, সহিহ মুসলিম: ২৭১০)*

১১. বিছানা ঝেড়ে নেওয়া

নবী ﷺ বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ তার বিছানায় যেতে চায়, সে যেন তার বিছানাকে ঝেড়ে নেয়, কারণ সে জানে না যে সেখানে আগে কী ছিল।" (সহিহ বুখারি: ৬৩২০, সহিহ মুসলিম: ২৭১৪)

১২. বাতি নিভিয়ে দেওয়া

নবী ﷺ বলেছেন, "যখন রাতে ঘুমাতে যাও, তখন বাতি নিভিয়ে দিও, কারণ ইঁদুরের মতো কোনো প্রাণী আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে এবং ঘরে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে।"*(সহিহ বুখারি: ৬২৯৬, সহিহ মুসলিম: ২০১২)*

ঘুমানোর সুন্নত সময়

- ◇ **এশার নামাজের পর তাড়াতাড়ি ঘুমানো**

- নবী ﷺ সাধারণত এশার নামাজের পর অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ এড়িয়ে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তেন।
- এটি রাতের তাহাজ্জুদ ও ফজরের জন্য সহজ করে এবং শরীরকে বিশ্রাম দেয়।

📖 **হাদিস:**

"নবী ﷺ এশার আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং এশার পর বেশি কথা বলা অপছন্দ করতেন।" *(সহিহ বুখারি: ৫৬৮, সহিহ মুসলিম: ৬৪৭)*

◇ **ফজরের আগে বা পরে ঘুম না করা**

- নবী ﷺ সাধারণত ফজরের পর ঘুমাতেন না, বরং তিনি সাহাবিদের সাথে কিছু সময় কাটাতেন বা ইবাদত করতেন।

📖 **হাদিস:** "হে আল্লাহ! আমার উম্মাহর জন্য তাদের সকালকে বরকতময় করে দাও।" *(সুনান আবু দাউদ: ২৬০৬, ইবনে মাজাহ: ২২৩৬*

ঘুম থেকে উঠার পর রাসুল (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী এই দোয়া পড়া উচিত:

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"

অর্থ: "সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের জীবিত করেছেন আমাদের মৃত্যুর পর, এবং তাঁরই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

মসজিদে যাওয়া ও বের হওয়ার সুন্নাহ

মসজিদে প্রবেশ করার এবং মসজিদ থেকে বের হবার জন্য আল্লাহর রাসূল সা. সুন্দর দু'টি দোআ শিক্ষা দিয়েছেন। মসজিদের আদব রক্ষায় এ দোআ দু'টি বেশ সহায়ক। হযরত আবু উবায়েদ থেকে বর্ণিত। মুসলিম শরীফের হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে:

للّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরোজাসমূহ খুলে দাও।"

বুখারী ও মুসলিম শরীফের এই দুটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থেই হযরত আবু কাতাদাহর বরাত দিয়ে উল্লেখ হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেন, "যখন তোমরা কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার আগে অবশ্যই দু'রাকআত নামায আদায় করে নিবে।"

মুখের দুর্গন্ধ অন্যকে কষ্ট দিতে পারে। অন্যের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করতে পারে এমন কিছু গ্রহণ করে যেন কেউ মসজিদে না যায়, এ বিষয়ে একাধিক হাদীসে আল্লাহর রাসূল সা. বেশ তাকিদের সাথে নিষেধ করেছেন। হেদায়াতের পরিপন্থী কোনো গান বা কবিতা পাঠ থেকেও নিষেধ করা হয়েছে। এমন কিছু হতে দেখলে নিষেধ করতে বলা হয়েছে। কারণ মসজিদ এজন্য তৈরী করা হয়নি।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা দিয়ে বের হওয়া,

মসজিদে ঢোকার সময় ডান পা আগে, আর বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের হওয়া সুন্নত।

দোয়া পাঠ করা

বের হওয়ার সময় এই দোয়াটি পড়া সুন্নত:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত উক্ত হাদীসের মূল বক্তব্য হবে:

.عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْ فَهُوَ حَظُّهُ

"হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে যে বিষয়ের জন্য মসজিদে যায়, সে ব্যক্তি সেটাই তার ভাগে পেয়ে থাকে।"

অর্থাৎ যে যে নিয়তে মসজিদে যায়,তার সে নিয়তের ভিত্তিতেই সে এর প্রতিদান পেতে থাকে। কেউতো মসজিদে যায় একটু বিশ্রাম গ্রহণ বা ঘুমানোর জন্য আবার কেউ বা যায় নামাজ বা ই'তেকাফের জন্য। অথবা সাদাকা করার জন্য। আমলের সওয়াব তো কেবলমাত্র নিয়তের উপর নির্ভর করে থাকে। মসজিদকে আবাদ এবং জীবন্ত রাখার জন্য যেমন নির্ধারিত সময়ানুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত আযান ও ইকামতসহ জামায়াতে নামাজ আদায় অপরিহার্য। তেমনি মুসলিম জনগণের শিশুদের এবং অশিক্ষিত বৃদ্ধ বা বয়স্কদের ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়ে শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা থাকাও অপরিহার্য। মসজিদ ঈমানদারের নৈতিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভের প্রাণ কেন্দ্র। আল্লাহর যিকির ও তার দ্বারে ধরণা দেয়া দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ কামনার জন্য সর্বোত্তম স্থান। এক ওয়াক্ত নামাজ শেষে পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য যার মনে প্রতিক্ষা থাকে প্রবল, মসজিদের বাইরে জাগতিক কোথাও গেলে অন্তরটা লেগে থাকে মসজিদের সাথে, সেই ব্যক্তি তো ঐ সাত শ্রেণীর ভাগ্যবান বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা কিয়ামতে আল্লাহর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাবে।

টয়লেটে প্রবেশকারীর করণীয় সুন্নাতসমূহ

بسم الله اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ দুআটি পাঠ করা এবং বের হওয়ার সময় غُفْرَانَكَ দুআটি পাঠ করা। এ ছাড়াও তার জন্য সুন্নাত হলো বাম পা আগে দিয়ে প্রবেশ করা, ডান পা আগে দিয়ে বের হওয়া এবং মাটির (মলমূত্র ত্যাগের স্থান) কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত লজ্জাস্থান উম্মোচিত না করা।

স্থানটা যদি উন্মুক্ত হয় তাহলে মুস্তাহাব হলো- দূরে যাওয়া এবং পর্দা করা যাতে দেখা না যায়। এগুলোর প্রমাণ হলো নিম্নরূপ:

১. জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى

"আমরা আল্লাহর রসূল এর সাথে সফরে বের হলাম। আল্লাহর রসূল প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে এত দূরে যেতেন যে, তাকে দেখা যেত না।"(সুনান আবু দাউদ, হা. ২, ইবনু মাজাহ, হা. ৩৩৫, শব্দ ইবনু মাজাহ এর। দেখুন সহীহ ইবনু মাজাহঃ ১/৬০।)

২. আলী হতে বর্ণিত। রসূল বলেন:

سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ :إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلَاءَ، أَنْ يَقُولَ :بِسْمِ اللَّهِ

"জিনের দৃষ্টি ও আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মাঝে পর্দা হলো যখন তাদের কেউ টয়লেটে প্রবেশ করে সে যেন বিসমিল্লাহ বলে।"(ইবনু মাজাহঃ ২৯৭, তিরমিযী, হা. ৬০৬, আলবানী (রহঃ) এটা সহীহ বলেছেন: ৩৬১১।)

৩. আনাস হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ :اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

নাবী যখন টয়লেটে প্রবেশ করতেন তখন এই দুআটি পাঠ করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নাপাক পুরুষ জীন এবং মহিলা জীন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।"(মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৪২, সহীহ মুসলিম, হা. ৭১৭, ফুআ. ৩৭৫।)

৪. আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، قَالَ غُفْرَانَكَ "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন।"(মুত্তাফাকুন আলাইহি: সহীহুল বুখারী, হা. ১৪২, সহীহ মুসলিম, হা. ৭১৭, ফুআ. ৩৭৫।)

৫. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ "নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন টয়লেটে যাওয়ার ইচ্ছা করতেন তখন মাটির (মলমূত্র ত্যাগের স্থান) নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার কাপড় ওঠাতেন না।"(সুনান আবু দাউদ, হা. ১৪, তিরমিযী, হা. ১৪।)

টয়লেট থেকে বের হওয়ার সুন্নাহ

এস্তেনজা বা শৌচকার্য করার পরে ডান পা দিয়ে বের হয়ে দোআ পড়বে **غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّيْ الْاَذٰى وَعَافَانِيْ.**

'অর্থ : '(হে আল্লাহ!) আপনার কাছে ক্ষমা চাই। সব প্রশংসা ওই আল্লাহর জন্য;

যিনি ক্ষতি ও কষ্টকর জিনিস থেকে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

শারীরিক সুস্থতায় সুন্নাহ

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রযুক্তি ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন রোগের উদ্ভব এবং পুরোনো রোগের পুনরুত্থান দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগ, যা পানি, খাদ্য ও বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগ মোকাবিলায় শক্তিশালী জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার অভ্যাস প্রয়োজন। মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ আমাদেরকে এমন পদ্ধতি শিখিয়েছে, যা আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি তাঁদের ভালোবাসেন, যাঁরা তাঁর দিকে ফিরে আসেন এবং নিজেদের পবিত্র রাখেন।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ২২২) নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২২৩) এই বাণী থেকে বোঝা যায়, ইসলামে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। নবীজির জীবনাচরণে আমরা এমন অনেক অভ্যাস দেখতে পাই, যা আজকের বিজ্ঞানও স্বাস্থ্যকর বলে প্রমাণ করেছে।

হাঁচি-কাশিতে মুখ ঢাকার সুন্নাহ

হাঁচি বা কাশির সময় মুখ ঢাকা আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০১৪ সালে এমআইটির (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) গবেষণায় দেখা গেছে, হাঁচি বা কাশির সময় নির্গত গ্যাসের মেঘ দীর্ঘ সময় বাতাসে ভাসতে পারে এবং এর কণা ৫ থেকে ২০০ গুণ দূরে ভ্রমণ করতে পারে। এটি বায়ুবাহিত রোগ ছড়ানোর ঝুঁকি বাড়ায়। মুহাম্মদ (সা.) হাঁচির সময় মুখ ঢাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসতাদরাকে হাকিম, হাদিস: ৭৫৮৮)

একজন মুসলিম হাঁচি বা কাশির সময় রুমাল, টিস্যু বা হাত দিয়ে মুখ ও নাক ঢাকেন। হাত দিয়ে ঢাকার ক্ষেত্রে ইসলামি নির্দেশনা অনুযায়ী হাত ধোয়া জরুরি, যা রোগের বিস্তার রোধ করে।

হাত ধোয়া: স্বাস্থ্য রক্ষার প্রথম ধাপ

হাত ধোয়া সংক্রমণ প্রতিরোধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়। অনেক ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া নাক বা মুখের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। ফেকাল-ওরাল পথে ছড়ানো রোগগুলো অপরিচ্ছন্ন হাতের মাধ্যমে খাদ্য বা বস্তুতে ছড়ায়। আধুনিক বিজ্ঞান এখন হাত ধোয়াকে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করে।

মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে হাত ধোয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি বলেন, সকালে হাত না ধুয়ে কোনো কিছু স্পর্শ করা উচিত নয়। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৬২) খাওয়ার আগে ও পরে (সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৩,৮৫৪), টয়লেট ব্যবহারের পর, এটি ফেকাল-ওরাল রোগের বিস্তার রোধ করে এবং অজুর মাধ্যমে হাত, মুখ, নাক, বাহু ও পা ধোয়া হয়, যা নামাজের জন্য অপরিহার্য। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৯২)

অজু নিজেই একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশ পরিষ্কার রাখে এবং রোগের বিস্তার রোধ করে।

নাক পরিষ্কার: শ্বাসতন্ত্রের সুরক্ষা

নাক আমাদের শ্বাসতন্ত্রের প্রথম প্রতিরক্ষা। এটি বাতাস পরিশ্রুত করে ধুলো, পরাগ, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ফুসফুসে পৌঁছাতে বাধা দেয়। নিয়মিত নাক পরিষ্কার না করলে সর্দি, সাইনাস সংক্রমণ, অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্টের ঝুঁকি বাড়ে।

নবী মুহাম্মদ (সা.) সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করতেন এবং দুই-তিনবার জোরে ঝাড়া দিয়ে পানি বের করতে বলেছেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস: ১৬২)

এই অভ্যাস নাকের পথ পরিষ্কার রাখে এবং শ্বাসতন্ত্রকে সুস্থ রাখে।

দাঁতের যত্ন: সামগ্রিক স্বাস্থ্যের অংশ

আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে, মাড়ির রোগ (পিরিয়ডন্টাল ডিজিজ) হৃদ্‌রোগ, স্ট্রোক ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। মুখের ব্যাকটেরিয়া শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে। মুহাম্মদ (সা.) মুখের পরিচ্ছন্নতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে।' (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৮৮৮) তিনি আরও বলেন, যদি উম্মতের ওপর বোঝা হওয়ার আশঙ্কা না হতো, তবে প্রতি নামাজের আগে মিসওয়াক ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৫২)

মিসওয়াক, যা সালভাডোরা পার্সিকা গাছের ডাল থেকে তৈরি, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান (সালভাডোরিন ও ট্রাইমেথাইলামিন) ধারণ করে। এটি প্লাক ও মাড়ির প্রদাহ কমায় এবং টুথব্রাশের মতোই কার্যকর। (জার্নাল অব ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন, ২০১৩)

নবীজির অন্যান্য স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনে আরও কিছু অভ্যাস ছিল, যা আধুনিক স্বাস্থ্যবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন তিনি শরীর, পোশাক ও বাড়ি পরিষ্কার রাখার ওপর জোর দিয়েছেন (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২,৮০৩) এবং তিনি সুগন্ধি ব্যবহারকে পূর্ববর্তী নবীদের অভ্যাস ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২,৭৮৬)

শেষ কথা

মুহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নাহ আমাদেরকে এমন একটি জীবনধারা শিখিয়েছে, যা শরীর, মন ও আত্মার সুস্থতা নিশ্চিত করে। হাত ধোয়া, নাক পরিষ্কার, মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং হাঁচি-কাশির সময় মুখ ঢাকার মতো সাধারণ অভ্যাস আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। এই সুন্নাহগুলো আমাদেরকে রোগ থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহায়তা করে।(https://www.sharebusiness24.com)

সুন্নাহর সুফল ও উপকারিতা

ব্যক্তিজীবনে সুন্নাত অনুসরণের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা রয়েছে, যা একজন মুসলিমের আত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক ও আখিরাতের জীবনকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।

আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করা যায়: পবিত্র কোরআনুল কারিমে বলা হয়েছে: "বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন ' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৩১) এ আয়াতে খুব সুন্দরভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে কোনো ব্যক্তি যদি মহানবী (সা.)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করেন, তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালোবাসবেন।

আত্মিক শান্তি ও স্থিরতা: সুন্নাতের অনুসরণ করলে জীবনে একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা আসে। যা মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা হ্রাসে সহায়ক হিসেবে প্রমাণিত।

কারণ মহানবী (সা.)-এর জীবন এমন এক আদর্শ, যা অনুসরণ করলে একজন ব্যক্তি সঠিক পথ ও নৈতিকতা বজায় রাখতে পারে। যা মানসিক শান্তির অন্যতম কারণ।

আখিরাতে মুক্তির পথ: সুন্নাতের অনুসরণ আখিরাতে মহানবী (সা.)-এর সুপারিশপ্রাপ্তির সুযোগ এনে দেয়। মহানবী (সা.) বলেছেন, 'আমার সুন্নাতের অনুসরণকারী আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয়।' সুন্নাত শুধু দাড়ি রাখা বা পাঞ্জাবি পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আপনার সকালবেলা ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, অফিসে এসে কাজ শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলুন। ছোট-বড় যেকোনো প্রাপ্তিতে আলহামদুলিল্লাহ বলুন, সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন, বাসা, অফিস, বিপণিবিতান- যেখানেই যখন অবস্থান করুন না কেন, অন্যকে সহযোগিতার মানসিকতা লালন করুন। এগুলোই সুন্নত। ব্যক্তিজীবনে এ ধরনের সুন্নাতগুলো অনুসরণ করলে একদিকে যেমন দুনিয়ায় শান্তি ও সম্মান পাওয়া যাবে, তেমনি আখিরাতেও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যাবে বহুগুণ।

পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়: সুন্নাতের অনুসরণ করে পরিবার পরিচালিত হলে পারস্পরিক সম্মান, দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। সমাজে অশান্তি ও অনৈতিকতা কমে আসে।

জীবনের প্রতিটি দিক যেমন- খাদ্য, ঘুম, ব্যবসা, উপার্জন, ইবাদত, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে যদি নবী (সা.)-এর সুন্নতকে অনুসরণ করা হয়, তাহলে তা একজন মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক হয়।

পারিবারিক জীবনে সুন্নাহ অনুশীলন

পরিবার হল সেই স্থান, যেখানে আমাদের চরিত্র ও মূল্যবোধের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়। নবী করিম (সা.) বলেছেন: *"তোমাদের মধ্যে সে লোকই উত্তম, যে নিজের পরিবার-পরিজনের প্রতি উত্তম আচরণ করে"*। আধুনিক ব্যস্ত জীবনে ঘরোয়া শান্তি ও বরকত ধরে রাখতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর পারিবারিক সুন্নাহগুলো অনুসরণ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ:

- **পরিবারের সাথে সদাচরণ ও দয়া:** পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোমলতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করা সুন্নত। নবীজী শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন; হাদীসে এসেছে, তিনি নিজের নাতিকে চুম্বন করছিলেন, তখন এক মরুঝাঁপ ব্যক্তি বলল, "আমার দশটি সন্তান আছে, আমি কখনো তাদের চুম্বন করিনি।" রাসূল (সা.) জবাবে বললেন: *"যে দয়া করে না, সে দয়া পাবে না"*। তাই বাড়িতে বাবা-মায়েরা সন্তানের সঙ্গে এবং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে দয়া, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার সুন্নতী আচরণ করা। ছোটখাটো উদাহরণ হিসেবে, কর্মশেষে বাসায় ফিরে হাসিমুখে সালাম দেয়া, সন্তানদের আদর করা কিংবা জীবনসঙ্গীর সাথে সহানুভূতিশীল কথা বলা – এসবই সুন্নাহর পরিপালন এবং এতে পরিবারে ভালোবাসা বাড়ে।
- **গৃহকর্মে সাহায্য করা:** পরিবারের কাজকর্মে অংশ নেওয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্দর সুন্নাহ। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবীজি ঘরের কাজে পরিবারের লোকদের সহায়তা করতেন; আজান শুনলেই নামাজের জন্য বাইরে চলে যেতেন। অর্থাৎ তিনি ঘরের কাজকে তুচ্ছ করেননি বরং পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন। আধুনিক যুগে স্ত্রী বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর সব কাজ চাপিয়ে না দিয়ে স্বামী বা পুরুষ সদস্যেরাও ঘর পরিষ্কার, বাজার করা, বাচ্চাদের দেখাশোনা ইত্যাদিতে সহযোগিতা করলে পারিবারিক বন্ধন মজবুত হয় এবং সুন্নতেরও অনুকরণ হয়। যেমন, রাতে খাবার পরে বাসনের কিছু অংশ নিজে ধুয়ে রাখা বা সন্তানকে পড়াতে বসা – এসব কাজ নবীজির পরিবার-সহায়ক আচরণেরই প্রতিফলন।
- **পরিবারের সাথে একসাথে সময় ও ইবাদত করা:** রাসূল (সা.) পরিবারের সাথে সময় কাটাতেন এবং পারিবারিক পরিবেশে আল্লাহর স্মরণ জারি রাখতেন। তিনি পরিবার

নিয়ে একত্রে খাবার খেতে বসতেন, খাবারের আগে-ব পরে দোয়া করতেন এবং সবাইকে *বিসমিল্লাহ* বলতে শেখাতেন। পরিবারের সদস্যদের সাথে একসাথে নামাজ পড়া বা রাতে শিশুদের ছোট ছোট দোয়া ও কুরআনের সূরা শেখানো সুন্নাতের চর্চা হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে, মা-বাবা মাগরিবের পর কিছুক্ষণ পারিবারিক মজলিসে নবীজির কোনো হাদীস শোনালেন বা শিশুদেরকে ছোট কারীমা (দোয়া) শিখালেন – এতে পরিবারে দ্বীনি পরিবেশ গড়ে উঠবে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দেন: *"হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজেদের ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো"*। তাই পরিবারের সবাইকে নিয়ে ফরজ ইবাদত পালনে যত্নবান হওয়া এবং ইসলামের মৌলিক শিক্ষাগুলো ঘরেই চর্চা করা জরুরি।

- **সালাম ও সুন্নতী অভিবাদন:** নবীজি ঘরে প্রবেশের সময় হাসিমুখে সালাম দিতেন এবং পরিবারের জন্য দোয়া করতেন। সালামের মাধ্যমে ঘরে শান্তি ও বরকত প্রবেশ করে। আজকাল অনেকে বাইরে সুন্দর আচরণ করলেও ঘরে ফেরার পর ক্লান্তি বা মানসিক চাপে পরিবারের সাথে অভদ্র ব্যবহার করেন। এটি ঠিক নয়। সুন্নাহ হলো – ঘরে প্রবেশেই "আসসালামু আলাইকুম" বলে শান্তির দোয়া দেয়া এবং পরিবারের সবার খোঁজখবর নেয়া। এই ছোট সুন্নতটি সম্পর্কের মধ্যে মহানুভবতা আনে। উদাহরণস্বরূপ, অফিস থেকে ফিরে মোবাইল ফোন একপাশে রেখে আগে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে কুশল বিনিময় করুন, তাঁদের দিনকাল জানতে চান – এটা নবীজির পারিবারিক আদর্শেরই অনুসরণ।

সংক্ষেপে, পারিবারিক জীবনে সুন্নাহ চর্চার মূলমন্ত্র হলো পরিবারের প্রতি উত্তম ব্যবহার, দয়া-মমতা, সহযোগিতা এবং আল্লাহর স্মরণ প্রতিষ্ঠা করা। নবীজি বলেন, *"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সে, যে তার পরিবারে সর্বশ্রেষ্ঠ"*– এই বাণীকে সামনে রেখে আমরা যদি ঘরের পরিবেশ সুন্নাহময় করি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের পরিবার হবে শান্তি, ভালোবাসা ও কল্যাণে পরিপূর্ণ।

কর্মজীবনে সুন্নাহর প্রয়োগ

আমাদের আয়ের স্থান তথা কর্মক্ষেত্রেও ইসলামের নীতি-আদর্শ মেনে চলা জরুরি। প্রফেশনাল জীবনে সততা, অধ্যবসায়, ন্যায়পরায়ণতা ও উত্তম চরিত্র দেখানো একজন মুমিনের পরিচয়। মহানবী (সা.) কর্মজীবনে সততা ও বিশ্বস্ততার অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন: *"যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়"*। অর্থাৎ ব্যবসা বা চাকরিতে অসাধুতা, প্রতারণা বা দুর্নীতিমূলক আচরণ ঈমানদারের কর্মসংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। আধুনিক কর্মক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুন্নাহসম্মত কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে:

- **সততা ও আমানতদারিতা বজায় রাখা:** অফিস বা ব্যবসার কাজে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সুন্নতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। লেনদেন ও দাফতরিক কাজে জালিয়াতি, মিথ্যা তথ্য প্রদান বা প্রতারণা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীসে এসেছে, নবীজি বলেছেন – *"যে ব্যক্তি ঠকায়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়"*। কাজেই পরীক্ষায় নকল করা থেকে শুরু করে ব্যবসায় ও চাকরিতে প্রতারণামূলক যে কোন কাজ কঠোরভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। একজন প্রকৃত মুসলিম কর্মী বা উদ্যোক্তা সে-ই, যার কাছে সহকর্মী ও গ্রাহকরা নিরাপদ থাকে এবং যার ব্যবহারে আস্থা পায়। উদাহরণ হিসেবে, অফিসে যদি কেউ অনুপস্থিত সহকর্মীর ক্রেডিট নিতে চায় বা মিথ্যা অজুহাতে অফিসের সম্পদ অপব্যবহার করতে চায় – আমাদের সুন্নাহর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বরং সততা অবলম্বন করা এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনে চলা জরুরি।
- **পরিশ্রম ও পেশাগত উৎকর্ষতা:** ইসলামে কাজকে ইবাদতের অংশ গণ্য করা হয় যখন তা হালাল উপায়ে এবং আন্তরিকতার সাথে করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনকারী মানুষকে শ্রদ্ধা করতেন এবং উম্মতকে পরিশ্রমী হতে উৎসাহিত করেছেন। এক হাদীসে আছে: *"শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিন থেকে উত্তম ও আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়"*– এতে নৈতিক ও শারীরিক দৃঢ়তাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা পরিশ্রম ও কর্মদক্ষতার সাথেও সম্পর্কিত। তাই কর্মক্ষেত্রে আমাদের উচিত আলসেমি বা অবহেলা না করে কাজটিকে যথাসম্ভব ভালোভাবে সম্পন্ন করা। এ যুগে প্রোফেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি, সময়মত কাজ শেষ করা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি মুসলিমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। যেমন, অফিসের প্রকল্পগুলিকে সময়সীমার মধ্যে মানসম্পন্নভাবে শেষ করা বা নিজের কাজের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণ নেয়া – এসবই ইসলামসম্মত ইতিবাচক পদক্ষেপ।
- **ন্যায়পরায়ণতা ও অধীনস্থদের প্রতি সুবিচার:** যদি আপনি ম্যানেজার, মালিক বা দলের নেতা হন, তবে সুন্নাহ অনুসারে অধীনস্থ কর্মচারী বা সহকর্মীদের প্রতি ন্যায়বান ও সহানুভূতিশীল হোন। নবীজি শ্রমিকের হক আদায়ে জোর দেন এবং বলেছেন: *"কর্মচারীর ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি দিয়ে দাও"*। এর অর্থ, সময়মত ও পুরোপুরি প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেয়া এবং অধীনস্থদের পরিশ্রমের মূল্যায়ন করা ইসলামের দাবি। আজকের যুগে অনেক প্রতিষ্ঠানে বেতন দিতে বিলম্ব বা শ্রমিকের অধিকার হরণ সাধারণ সমস্যা, যা স্পষ্ট অন্যায়। একজন মুসলিম কর্তৃপক্ষ তা এড়িয়ে চলবে। বাস্তব উদাহরণ হিসাবে, আপনি যদি কোম্পানির মালিক হন, তবে প্রতিমাসে নির্ধারিত তারিখে কর্মীদের বেতন পরিশোধ নিশ্চিত করবেন এবং অতিরিক্ত সময় কাজ করলে উপযুক্ত ওভারটাইম দিবেন – এটাই সুন্নতের শিক্ষা। এছাড়া

কর্মস্থলে সবাইকে সম্মান করা, গালি-গালাজ থেকে বিরত থাকা এবং যৌথ কাজে একে অপরকে সাহায্য করা সুন্নতী আচরণ। হাদীসে আছে, নবীজি সর্বদা দুর্বল ও শ্রমজীবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকতেন এবং তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করতেন।

- **প্রার্থনা ও ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা রক্ষা:** কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার অজুহাতে ইসলামের ফরজ বিধানগুলো অবহেলা করা যাবে না। সাহাবীদের জীবন থেকে আমরা দেখি, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করলেও নামাজের সময় হলে সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ থামিয়ে দিতেন। কুরআন বলেছে: *"এমন লোকও আছে যাদের ব্যবসা ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামাজ কায়েম থেকে বিমুখ করে না"*(২৪:৩৭)। তাই অফিসে বা দোকানে কাজের ফাঁকে সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করা, জুমার দিন ছুটি নিয়ে মসজিদে যাওয়া – এসবের ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যদি নিয়োগকর্তা হন, কর্মীদের নামাজের বিরতি ও জায়নামাজের জায়গা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। আর কর্মী হলে নামাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে সে অনুযায়ী কাজের সময় ভাগ করবেন। এভাবে কাজ ও দ্বীনের সমন্বয় করাই সুন্নতের দাবি। যেমন, দুপুরের খাবারের সময়টা ব্যবহার করে জোহর/আসর পড়ে নেওয়া বা অফিস শেষে মাগরিবের সময় বাসায় পৌঁছে প্রথমেই নামাজটা সেরে নেওয়া – এ ধরনের অভ্যাস আপনাকে দ্বীনের উপর অটল রাখবে এবং কাজে বরকতও বাড়াবে।

সারসংক্ষেপে, কর্মজীবনে সুন্নাহ চর্চা মানে নিজের পেশাকে ইবাদত হিসেবে দেখা এবং সেখানে সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা ও কল্যাণকর আচরণ প্রতিষ্ঠা করা। এতে পরকালীন সফলতার পাশাপাশি পৃথিবীতেও সুনাম ও আস্থা অর্জিত হবে। নবীজির শিক্ষামতো যে কর্মী বা ব্যবসায়ী *আমানতদার, সত্যবাদী ও পরোপকারী,* তিনি কিয়ামতের দিনে নবীদের সঙ্গ লাভের মর্যাদা পাবেন বলে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের কর্মস্থলে সুন্নাহ মোতাবেক চলার তৌফিক দিন।

প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগে সুন্নাহর চর্চা

আধুনিক যুগে ইন্টারনেট, স্মার্টফোন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আমাদের জীবনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। এগুলোর সঠিক ব্যবহার এবং অপব্যবহার – দুটোই আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। যদিও প্রযুক্তি নিজেই নিরপেক্ষ, এর ব্যবহারে ইসলামের নীতিমালা মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সময় সরাসরি সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না, তবে তিনি যে নীতিগুলো দিয়ে গেছেন সেগুলো ডিজিটাল জগতে সমান প্রযোজ্য। ইসলাম আমাদের বলে, প্রকাশ্য-গোপন সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে এবং জবাবদিহিতার কথা স্মরণ রাখতে। সামাজিক যোগাযোগ ও অনলাইন কার্যক্রমে নিম্নোক্ত সুন্নাতসম্মত আচরণ অনুসরণ করা যেতে পারে:

- **সত্যবাদিতা ও যাচাই-বাছাই:** ফেসবুক, টুইটার বা হোয়াটসঅ্যাপে কোনো খবর, গুজব বা তথ্য শেয়ার করার আগে তা সত্য কিনা যাচাই করা ঈমানের অংশ। কুরআনে সাফ নির্দেশ এসেছে: *"হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো অসৎ ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তা পরীক্ষা করে দেখো, যেন অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কেউকে ক্ষতি করে না বসো"*। সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো পোস্ট দেখেই মুগ্ধ হয়ে বা ক্রুদ্ধ হয়ে তা শেয়ার করে দেয়া সুন্নতের পরিপন্থী হতে পারে যদি সেটা মিথ্যা হয়। মুসলিম হিসেবে আমাদের *সচেতন ডিজিটাল নাগরিক* হতে হবে – কোনো খবরের সত্যতা নিশ্চিত না হয়ে ফরওয়ার্ড না করা, কারো বিরুদ্ধে শুনে নিয়ে সাথে সাথে বদনাম না করা ইত্যাদি পালন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো ভাইরাল সংবাদ পেলেন যে "অমুক কোম্পানির পণ্য হারাম" – তখন সাথে সাথে শেয়ার না করে প্রথমে বিশ্বস্ত সোর্স থেকে যাচাই করবেন। এভাবে চললে অনলাইনে গুজব ও অপপ্রচার রোধে আপনি সুন্নাহর অনুসারী হবেন।
- **গিবত ও অশোভন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা:** অনলাইনে আমরা মুখোমুখি না থাকায় অনেকেই লেখনীতে শিষ্টাচার ভুলে যাই। কারো ছবিতে বা স্ট্যাটাসে কটু মন্তব্য করা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা নিয়ে সবাইকে জানিয়ে দেয়া (যা মূলত গিবত/পরনিন্দা), কিংবা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার – এগুলো অনেকে অনলাইনে খুব সহজে করে ফেলে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, ইসলামে পরনিন্দা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; আল্লাহ বলেন, *"এক ভাই অন্য ভাইয়ের পচা মাংস খাওয়ার মতো ঘৃণ্য কাজ"* এটি। নবীজি শিখিয়েছেন: *"যে আল্লাহ ও পরকালকে মানে, সে ভালো কথা বলবে নতুবা চুপ থাকবে"*। সুতরাং ফেসবুকের কমেন্ট হোক বা মেসেঞ্জার গ্রুপ, আমাদের জিহ্বা/কলম (কীবোর্ড) সংযত রাখা সুন্নাহ। কোনো বিষয়ে ভিন্ন মত থাকলে গালি না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভদ্র ভাষায় বলুন, নইলে চুপ থাকুন। গসিপ বা ট্রলের সংস্কৃতি ইসলামসম্মত নয়। প্রয়োজনে অনলাইনে কারো সমালোচনা করতে হলে সম্ভাব্য সুন্দর ভাষা ও নরমভাবে উপদেশের স্টাইলে বলুন, যেন সেটি উপকারে আসে। মনে রাখবেন, *"একজন প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহ্বা ও হাতের অনিষ্টতা থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে"* – ভার্চুয়াল জগতেও এ হাদীসের বাস্তবায়ন জরুরি।
- **পর্নোগ্রাফি ও অশ্লীল কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা:** ইন্টারনেটের সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো অশ্লীলতা সহজলভ্য হওয়া। কিন্তু ইসলামের শিক্ষা হল, প্রকাশ্যে হোক বা একান্তে – আমাদের চোখ, কান ও অন্তরকে পাপ থেকে হেফাজত করা। কুরআনে এসেছে, মুমিন পুরুষ ও নারীদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে বলা হয়েছে (নূর:৩০-৩১)। সুতরাং অনলাইনে চোখের সামনে কোনো

অনৈসলামিক বা অশালীন বস্তু এলে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া বা স্ক্রল পেরিয়ে যাওয়া উচিত। পর্নোগ্রাফি দেখা বা ছুপে ছুপে হারাম যোগাযোগ করা মহান গুনাহ, যা আমাদের আত্মাকে ধ্বংস করে এবং বাস্তব জীবনকেও বিপর্যস্ত করে। নিজেকে এ থেকে বাঁচাতে সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকা জরুরি। স্মরণ রাখুন, আমাদের অনলাইন কার্যকলাপও আল্লাহ দেখছেন এবং ফেরেশতারা লিপিবদ্ধ করছেন। তাই কম্পিউটার বা মোবাইলে একা থাকলেও মনে করবেন না যে আপনি একা – আল্লাহর উপস্থিতির সচেতনতা (মুরাকাবা) রাখুন। এভাবে অনলাইন দুনিয়াতেও তাকওয়া বজায় রাখাই নবীজির আদর্শ।

- **সময় অপচয় রোধ ও উপকারী প্রযুক্তি ব্যবহার:** প্রযুক্তির সুফল পেতে হলে এর অপব্যবহার এড়াতে হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বা ইউটিউবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অর্থহীন স্ক্রলিং করা, গেমসে ডুবে থাকা ইত্যাদি সময়ের অপচয়; হাদীসে এসেছে: *"দুটি নিয়ামতের ব্যাপারে বহু মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত: সুস্থতা এবং অবসর সময়"*। সুতরাং আমাদের ফ্রি সময়ের জবাবদিহিতাও আছে। সুন্নাহ মোতাবেক চলতে চাইলে বিনোদন ও প্রযুক্তি ব্যবহারে ভারসাম্য আনতে হবে। দিনে কতক্ষণ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারে ব্যয় করছেন তা সীমিত করুন। আপনি স্মার্টফোনে এমন কিছু অ্যাপ বা ফিল্টার রাখতে পারেন যা অপব্যয় রোধ করে। অন্যদিকে প্রযুক্তিকে ভালো কাজে লাগান – ইসলামিক লেকচার শোনা, কুরআন-হাদীসের অ্যাপ ব্যবহার, নিয়মিত উল্লেখযোগ্য খবরগুলো জানা ইত্যাদি উপকারী কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, দৈনিক একটি ইসলামী ভিডিও/লেকচার শোনা। নবীজি বলেন, *"যে কল্যাণের দিকে পথ দেখায়, সে যেন সেই কল্যাণ কর্মটি নিজে করলো"*– সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাল বিষয় শেয়ার করে আপনি পরোপকার করতে পারেন। তবে সবকিছুর মাপকাঠি হল নিয়ত ঠিক রাখা এবং শরীয়তের সীমা অতিক্রম না করা।
- **অনলাইন যোগাযোগে সৌজন্যতা ও শালীনতা:** ভার্চুয়াল যোগাযোগে আমাদের আচরণ বাস্তব জগতের মতোই ভদ্র ও শালীন হওয়া জরুরি। রাসূল (সা.) সর্বদা মিষ্টি ভাষায় কথা বলতেন, মুখে হাসি রাখতেন এবং সামনাসামনি দেখা হলে সালাম দিয়ে অভিবাদন জানাতেন। অনলাইনেও কারো সঙ্গে চ্যাট শুরু করলে সালাম দিয়ে শুরু করুন, সম্ভাষণের উত্তরে উত্তম জবাব দিন। মেসেজে অথবা ইমেইলে শিষ্টাচার বজায় রেখে কথা লিখুন – 'ধন্যবাদ', 'অনুগ্রহ করে' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। কারো মতের বিরোধিতা করলে ভদ্রভাবে করুন। একটা সুন্নতী উদাহরণ হলো মুচকি হাসি – যদিও ইমোজি দিয়ে এটি বোঝানো হয়, তবে বাস্তবে সুযোগ হলে ভিডিও কলে বা লাইভে মুখে হাসি রাখুন; হাদীসে আছে: *"তোমার ভাইয়ের মুখের উপর*

হাসিমুখে থাকা তোমার জন্য একটি সাদকা (দান)"। তাই ভার্চুয়াল মিটিং হোক বা টেক্সট, আপনার ভদ্রতা, সদয় ভঙ্গি ও সুন্দর শব্দচয়ন দ্বারাও আপনি ইসলামকে উপস্থাপন করছেন। নবীজি আরো বলেন, *"ভালো কথাও দানের সমতুল্য"*– অর্থাৎ অনলাইন কমেন্টে বা পোস্টে উৎসাহমূলক সুন্দর বাক্য লিখলে সেটিও নেকির কাজ হতে পারে। অপরদিকে অহেতুক বিতণ্ডা করা, ট্রল করা বা অন্যকে অপমান করা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। সামাজিক মাধ্যমে *সুন্নাহসম্মত শিষ্টাচার* রক্ষা করলে আপনি দ্বীনকে সমুন্নত রাখার পাশাপাশি নিজের অনলাইন মান-Mর্যাদাও রক্ষা করতে পারবেন।

সংক্ষেপে, প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগের জগতে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে নবীজির শিক্ষা প্রয়োগ করতে হবে – সত্য বলুন, অসত্য এড়ান; ভাল কথার প্রসার করুন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকুন; পর্দা রক্ষা করুন এবং বিনয় ও সৌজন্য বজায় রাখুন। এভাবে ডিজিটাল জগতকে সুন্নাহর আলোয় আলোকিত করা সম্ভব।

সময় ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলায় সুন্নাহ

সময় হলো আমাদের জীবনের পুঁজি। আধুনিক যুগের বড় চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হল কার্যকরভাবে সময় ব্যবস্থাপনা করা – কাজ, পরিবার, ইবাদত ও বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রাখা। মহানবী (সা.) এর জীবন থেকে আমরা আদর্শ সময়ব্যবস্থাপনার উদাহরণ পাই। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগিয়েছেন এবং অন্যদেরও সময়ের মূল্য বুঝিয়েছেন। একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে নবীজি উপদেশ দেন: *"পাঁচটি জিনিসকে অপর পাঁচটির পূর্বে গনিমত (সুযোগ) জেনে নাও: বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবন, অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতা, দরিদ্রতার পূর্বে তোমার স্বচ্ছলতা, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর, মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে মূল্যায়ন করো"*। এই মহান আদর্শকে বাস্তবে কাজে লাগাতে কিছু সুন্নতী পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়:

- **শুরুতেই দিনের কাজ পরিকল্পনা করা:** নবীজি সকালে ঘুম থেকে উঠেই আল্লাহর নাম নিয়ে নতুন দিনের সূচনা করতেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিয়মিত ধারাবাহিকতায় সম্পন্ন করতেন। আমরা যদি প্রতিদিন সকালে বা আগের রাতে দিনের করণীয় কাজগুলোর একটি তালিকা করি (To-Do list), তবে সময় নষ্ট কম হবে। ইসলাম চায় না যে মুমিন তার সময় এলোমেলোভাবে নষ্ট করুক; বরং সকালে ফজরের পর অলসভাবে ঘুমিয়ে না থেকে সক্রিয় হওয়া সুন্নাহ। সকালের সময়টুকু সবচেয়ে বরকতময় – পড়াশোনা, কাজের প্রস্তুতি, কিংবা পরিবারের সাথে সময় – যে দিকেই ব্যয় করবেন, সেটিতে সফলতা আসার সম্ভাবনা বেশি। পরিকল্পনাহীনভাবে দিন শুরু করলে অনেক সময় অপচয় হয়ে যায়, তাই সুন্নতের অনুসরণে সুশৃঙ্খল রুটিন বানিয়ে নিজেকে পরিচালিত করুন।
- **প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ ও ফরজ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া:** নবীজির শিক্ষা হল, গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিলম্ব না করে যথাসময়ে সম্পন্ন করা। যেমন নামাজের সময় হলে সাথে সাথে নামাজ আদায় করতেন, যেটি আমাদের শিখিয়ে যায় যে প্রতিটি কাজের নিজস্ব উত্তম সময় আছে। আপনাকে যদি একদিকে অফিসের ডেডলাইন আরেকদিকে পরিবারের দরকার এবং একইসাথে নামাজের সময় হয়ে যায় – তখন সুন্নাহর অনুসারী হয়ে ফরজ নামাজটাকে সবার আগে রাখুন। এরপর যেটি জরুরি, সেটি করুন। এভাবে ফরজ, ওয়াজিব দায়িত্ব আগে এবং গৌণ কাজ পরে – এই নীতি কার্যকর করুন। আধুনিক 'time management' তত্ত্বেও "prioritize your tasks" বলা হয়, যা আসলে নবীজিরই সুন্নাতি শিক্ষা। উদাহরণস্বরূপ, সকালে অফিসে গিয়ে প্রথমে সবচেয়ে কঠিন কাজটি সম্পন্ন করুন (একে 'eat that frog'ও বলে) – তাহলে বাকি সময়টায় চাপ কমে যাবে এবং কাজগুলো সহজ হবে। মোটকথা, গুরুত্বপূর্ণ কাজকে পেছনে ফেলে সময় নষ্ট করা সুন্নাহবিরুদ্ধ; বরং *"যা তোমার*

উপকারে আসবে, তাতে দৃঢ় থাক এবং আল্লাহর সাহায্য চাই"– হাদীসের এই নির্দেশনা মানতে হবে।

- **সময় নষ্টকারী বিষয়ে সংযম:** আমাদের সময় ছিনিয়ে নেয় এমন অভ্যাসগুলো পরিহার না করলে কোনো পরিকল্পনাই কার্যকর হবে না। সোশ্যাল মিডিয়া অতিরিক্ত ব্যবহারের বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও টেলিভিশন সিরিয়াল, অপ্রয়োজনীয় আড্ডা, অতিরিক্ত ঘুম প্রভৃতি কমিয়ে আমরা সময় বাঁচাতে পারি। নবীজি অনর্থক কাজ পছন্দ করতেন না; হাদীসে আছে: *"কারো ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ হলো অনর্থক বিষয় ত্যাগ করা"*(তিরমিজি)। তাই সুন্নাহর অনুসরণে নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন – দিনশেষে আমি কতক্ষণ অর্থহীন কাজে ব্যয় করছি? যদি দেখেন অনেকটা সময় ইউটিউবের রekomেণ্ডেড ভিডিও দেখে বা অনলাইনে সংবাদে স্ক্রল করে চলে যাচ্ছে, তাহলে সেটি কাটছাঁট করুন। অবসর বিনোদন নিশ্চয়ই আছে, তবে সেটি সীমিত করুন এবং নির্দিষ্ট সময়ে করুন। যেমন, ঠিক করলেন যে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত পরিবারের সাথে বিনোদনমূলক সময় দিবেন (টিভি/গেম ইত্যাদি), তারপর ১০টার পর থেকে ঘুমের প্রস্তুতি – এইভাবে সময়ের খাত নির্ধারণ করে দিলে অপচয় কমে আসবে।
- **অবসর সময়কে সৎ কাজে লাগানো:** কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যেটুকু অবসর বা বিরতি মেলে, একজন মুসলিম তা অযথা নষ্ট না করে কল্যাণমূলক কিছু করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রাফিকে আটকে আছেন ১৫ মিনিট – এখানে রাগ করা বা উদ্দেশ্যহীন ভাবার বদলে কিছু যিকির (সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি) করে নিন বা কুরআন তিলাওয়াত শুনে নিতে পারেন। দুপুরের খাবার সময় হলে খাওয়ার পরে ১০ মিনিট কুরআন পড়ুন বা একটি ইসলামিক নিবন্ধ পড়ে জ্ঞান বাড়ান। নবীজি বিরতি সময়গুলোতেও আল্লাহর স্মরণে থাকতেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে জুমার দিন সূরা কাফ পড়ার তাগিদ দিয়েছেন – আজ আমরা যদি জুমা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে দৈনিক কিছু কিছু কুরআন পড়ি, তাতে সপ্তাহান্তে পুরো সূরাটি পড়া হয়ে যাবে। মোটকথা, অবসর সময়কে হালকা ভাবে না দেখে এটিকে একটি *"নেয়ামত"*মনে করে কাজে লাগাতে হবে। এই অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে জীবনে অনেক বরকত সৃষ্টি হবে এবং বড় বিপর্যয় থেকেও বাঁচা যাবে।
- **প্রতিদিনের জন্য আত্মসমালোচনা ও পরিকল্পনা পুনর্মূল্যায়ন:** হযরত উমর (রা.) বলেছেন, *"নিজেকে হিসাবের আগে হিসাব করো"*– অর্থাৎ প্রত্যেকদিন শেষে নিজ কাজগুলোর ফিরিস্তি মাথায় বা ডায়েরিতে মিলিয়ে দেখা সুন্নতের অংশ হতে পারে। এতে আপনি বুঝতে পারবেন সময় কীভাবে ব্যয় হলো, কোথায় সময় অপচয় হয়েছে,

আগামীকাল কীভাবে আরো ভালোভাবে সময় কাজ নিতে পারবেন। রাতে ঘুমানোর আগে নবীজি কিছু দোয়া পড়তেন এবং দিনের আমলের হিসাব নিতেন বলে বর্ণিত আছে। আমরাও ছোট্ট করে চিন্তা করতে পারি: আজকে কতটা কাজ প্রোডাক্টিভ হয়েছে? কোনো ফরজ বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছুটে গেছে কি? যদি যায়, সাথে সাথে তওবা করে কাল সংশোধনের নিয়ত করি। আর ভালো কিছু সম্পন্ন হয়ে থাকলে আলহামদুলিল্লাহ বলি। এভাবে *মুহাসাবার* (আত্মমূল্যায়ন) সুন্নাহ জীবনে প্রয়োগ করলে আমাদের সময় ব্যবস্থাপনা ক্রমশ উন্নত হবে এবং আল্লাহর কাছে জবাবদিহির প্রস্তুতিও হবে।

সবশেষে, মনে রাখার মতো হাদীস হল: *"কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা এক স্থান থেকে নড়বে না যতক্ষণ পাঁচ প্রশ্নের জবাব না দিবে – তার (জীবন) কীভাবে ব্যয় করেছে, যৌবনকাল কী কাজে ব্যয় করেছে, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে, এবং অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কিনা"* (তিরমিজি)। এই হাদীস আমাদের শিখায় যে জীবনের প্রতিটি সময় ও সম্পদের জন্য জবাবদিহি আছে। তাই সুন্নাহ মোতাবেক সময়ের সদ্ব্যবহার করা শুধু দুনিয়াবী সাফল্যের জন্য নয়, পরকালের সফলতার জন্যও অপরিহার্য।

আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জের মধ্যে সুন্নাহ চর্চা করা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু সত্য হলো – রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা সর্বকালের জন্যই প্রযোজ্য এবং কল্যাণকর। ঘরের ভিতরে পারিবারিক জীবন হোক বা বাইরের কর্মক্ষেত্র, সামাজিক যোগাযোগের মাঠ হোক বা ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্র – সর্বত্র ইসলাম আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ ও নৈতিক জীবনযাপনের পথ দেখায়। নবীজির সুন্নাহর বাস্তব কৌশলগুলো ধীরে ধীরে জীবনে বাস্তবায়ন করলে আমাদের জীবন সহজতর ও বরকতময় হবে।

পরিবারে শান্তি, কর্মজীবনে সাফল্য, প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, শারীরিক-মানসিক সুস্থতা এবং সময়ের মূল্যায়ন – এসব ক্ষেত্রে যদি আমরা ইসলামের নির্দেশনা মানি, তবে দ্বীন ও দুনিয়া দুটোতেই সফল হতে পারব। অবশ্যই, পরিবর্তন রাতারাতি আসবে না; তবে ছোট ছোট সুন্নত পালন দিয়ে শুরু করলে আল্লাহ তাআলা তাতে বড় Blessing (বরকত) দান করেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে জীবিত করল, সে আমাকেই ভালোবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসল সে জান্নাতে আমার সঙ্গেই থাকবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৬৭৮)

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি (আমার) এমন কোনো সুন্নত জীবিত করবে, যা আমার (মৃত্যুর পর) পর বিলীন হয়ে যাবে, তার জন্য আছে সেই সুন্নতের ওপর

আমলকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব। এ ক্ষেত্রে তাদের সওয়াব হতে কিছুই কমানো হবে না।' (তিরমিজি : হাদিস ২৬৭৭)

সুন্নতই মুক্তির পথ ও বর্জনে পরিণতি

মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ

মহান আল্লাহ তাআলা এই মানবজাতিকে তাঁর হাবিবের অনুকরণ ও অনুসরণের নির্দেশ তাঁর পবিত্র কালামে পাকে আমাদের জানিয়েছেন এবং অবাধ্যতা ও পালন না করলে কি হবে তাও জানিয়েছেন-

মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর আমি তোমাকে রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি।' (সুরা: নিসা, আয়াত: ৮০)

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে হাদিস ও সুন্নাহ মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানে এমন কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলো—

আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফায়সালা মেনে নিতে মুমিনরা বাধ্য: হাদিস হলো মহানবী (সা.)-এর ফায়সালা। আর মুমিনরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ফায়সালা মেনে চলতে বাধ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দিলে কোনো মুমিন নর-নারীর জন্য সে বিষয়ে নিজস্ব কোনো ফায়সালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে।' (সুরা: আহজাব, আয়াত: ৩৬)

কথা ও কাজে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আগে বাড়া নিষিদ্ধ: হাদিস হলো নবীজির কথা। আর হাদিস না মানা নবীজির কথা থেকে নিজের কথা প্রাধান্য দেওয়ার নামান্তর। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আগে বেড়ো না।

আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।' (সুরা: হুজুরাত, আয়াত: ১)

নবীজির আনুগত্য যে করে না সে কাফির: হাদিস না মানা নবীজির আনুগত্য না করার সমতুল্য। আর যে নবীজির আনুগত্য করে না সে কাফির। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'তুমি বলো, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো।

যদি তারা এতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে (তারা জেনে রাখুক যে) আল্লাহ কাফিরদের ভালোবাসেন না।'
(সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৩২)

নবীজির আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর: হাদিসের অনুসরণ মানে নবীজির আনুগত্য। আর নবীজির আনুগত্য আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর। মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের ওপর আমি তোমাকে রক্ষক হিসেবে প্রেরণ করিনি।'
(সুরা : নিসা, আয়াত : ৮০)

নবীজির আনুগত্য না করলে বিবাদ দেখা দেবে: আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। আপসে ঝগড়া কোরো না। তাহলে তোমরা হীনবল হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি উবে যাবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন।'
(সুরা: আনফাল, আয়াত: ৪৬)

নবীর বিরুদ্ধাচরণে আজাব আসবে: হাদিস না মানা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত। আর নবী (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহর আজাব আসবে। আল্লাহ বলেন, 'রাসুলের প্রতি আহবানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহবানের ন্যায় গণ্য কোরো না। আল্লাহ তাদের জানেন, যারা তোমাদের মধ্যে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হোক যে ফিতনা তাদের গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের ওপর আপতিত হবে।' (সুরা: নূর, আয়াত: ৬৩)

নবীজির আনুগত্য না করার পরিণাম জাহান্নাম: নবীজি (সা.)-এর আনুগত্য না করার পরিণাম জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই হলো মহা সফলতা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। আর তার জন্য আছে অপমানজনক শাস্তি।'
(সুরা : নিসা, আয়াত : ১৩-১৪)

নবীজির নিয়ে আসা বিধি-বিধান গ্রহণে কোরআনের নির্দেশ : মহান আল্লাহ বলেন, '...আর রাসুল তোমাদের যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।' (সুরা : হাশর, আয়াত : ৭)

মুমিনদের জন্য নবীজির জীবনে আছে উত্তম আদর্শ : মহানবী (সা.)-এর নবুয়তি জীবনের কথা ও কাজের সমষ্টি হলো হাদিস। আর মুমিনদের জন্য মহানবী (সা.)-এর জীবনে আছে

উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিবসকে কামনা করে এবং বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে তার জন্য।'

(সুরা : আহজাব, আয়াত : ২১)

মহানবী (সা.)-এর কথা-কাজ সব কিছু ওহি : মহানবী (সা.) নিজে থেকে কোনো কথা বলেননি, কোনো কাজ করেননি। যা বলেছেন, যা করেছেন সব কিছু মহান আল্লাহর হুকুমে। সুতরাং তাঁর আনুগত্য অপরিহার্য। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'তিনি [রাসুল (সা.)] নিজ খেয়ালখুশিমতো কোনো কথা বলেন না। এটি শুধু তা-ই, যা তাঁর কাছে ওহি হিসেবে পাঠানো হয়।'

(সুরা : নাজম, আয়াত : ৩-৪)

হাদিস হলো কোরআনের ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)-কে কোরআনের ব্যাখ্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর গোটা জীবনে কোরআনের যা ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা-ই মূলত হাদিস। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তোমার কাছে নাজিল করেছি কোরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও, যা তাদের প্রতি নাজিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৪৪)

হাদিসে পাকে আল্লাহর রাসুলের অনুসরণের নির্দেশ

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি যে ব্যাপারে তোমাদেরকে (বর্ণনা না দিয়ে) ছেড়ে দিয়েছি, সে ব্যাপারে তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ, সে ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করো না)। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অধিক প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সঙ্গে মতভেদ করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন জিনিস থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা হতে দূরে থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কাজের আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমত পালন কর।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ متفقٌ عليه

عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال دعوني ما تركتكم انما اهلك من كان قبلكم كثرة سوالهم واختلافهم على انبيابهم فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه

(বুখারী ৭২৮৮, মুসলিম ৩৩২১)

আবূ নাজীহ ইরবায ইবনে সারিয়াহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী বক্তৃতা শুনালেন যে, তাতে অন্তর ভীত হল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে গেল। সুতরাং আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এ যেন বিদায়ী ভাষণ মনে হচ্ছে। তাই আপনি আমাদেরকে অন্তিম উপদেশ দিন।' তিনি বললেন,

’’আমি তোমাদেরকে আল্লাহভীতি এবং (রাষ্ট্রনেতার) কথা শোনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি; যদিও তোমাদের উপর কোন নিগ্রো (আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসী) রাষ্ট্রনেতা হয়। (স্মরণ রাখ) তোমাদের মধ্যে যে আমার পর জীবিত থাকবে, সে অনেক মতভেদ বা অনৈক্য দেখবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নাত ও সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের রীতিকে আঁকড়ে ধরবে এবং তা দাঁত দিয়ে মজবূত ক’রে ধরে থাকবে। আর তোমরা দ্বীনে নব উদ্ভাবিত কর্মসমূহ (বিদআত) থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।

عَنْ أَبِي نَجيحٍ العِرباضِ بنِ سَارِيَةَ قَالَ :وَعَظَنَا رسولُ اللهِ ﷺ مَوعظةً بَليغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ، فَقُلْنَا :يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّر عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثيراً فَعَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بالنَّواجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فإِنَّ كلَّ بدعة ضلالة رواه أَبُو داود والترمذي وَقالَ حديث حَسَنٌ صَحِيْحٌ

عن ابي نجيح العرباض بن سارية قال :وعظنا رسول الله ﷺ موعظة بليغة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا :يا رسول الله، كانها موعظة مودع فاوصنا، قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تامر عليكم عبد حبشي وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

(আবু দাঊদ ৪৬০৯, তিরমিযী ২৬৭৬, ইবনে মাজাহ ৪২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে যাবে; কিন্তু সে নয় যে অস্বীকার করবে। জিজ্ঞাসা করা হল, ’হে আল্লাহর রসূল! (জান্নাতে যেতে আবার) কে অস্বীকার করবে?’ তিনি বললেন, যে আমার অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করবে, সেই জান্নাত যেতে অস্বীকার করবে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدخُلُونَ الجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى قيلَ :وَمَنْ يَأبَى يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى رواه البخاري

عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى قيل :ومن يابى يا رسول الله ؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى رواه البخاري

(বুখারী ৭২৮০)

মিকদাম বিন মা’দিকারিব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মতো (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, ’তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই

হারাম মনে কর। সতর্ক হও! আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন, তাও আল্লাহর হারাম করার মতোই।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهِ

عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله ﷺ انه قال الا انى اوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل شبعان على اريكته يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا وان ما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله

(আবূ দাঊদ ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১২, দারেমী ৫৮৬, মিশকাত ১৬৩)

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গণ্ডির ভিতরেই থাকে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নাত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله ﷺ لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك

(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমাদ ৬৯৫৮, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, সেই সত্তার কসম! এই উম্মতের যে কেউ—ইয়াহুদী হোক বা খ্রিস্টান আমার কথা শুনবে, অতঃপর যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তার প্রতি ঈমান আনবে না, সেই জাহান্নামবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

عن ابى هريرة عن رسول الله ﷺ انه قال والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى احد من هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يومن بالذى ارسلت به الا كان من اصحاب النار

(মুসলিম ৪০৩)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেদের মাঝে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন, ''শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে—এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ :قَدْ يَئِسَ الشَّيْطَانُ بِأَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَّهُ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال :قد يئس الشيطان بان يعبد بارضكم ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من اعمالكم، فاحذروا يا ايها الناس اني قد تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنة نبيه

(হাকেম ৩১৮, সহীহ তারগীব ৩৬)

নবি (সাঃ) থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি-

সাহল ইবনে সা'দ রা. বর্ণনা করেন, একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলীর মাঝে সামান্য ফাঁক করলেন। এরপর এ দুই আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বললেন-

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ.

আমি এবং এতীমের দায়িত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩০৪, ৬০০৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫০; জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৮

হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ বলেন-

এতীমের দায়িত্ব গ্রহণের অর্থ হচ্ছে, তার অন্য-বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। তাকে আদব-আখলাক ও ধর্মীয় বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া। তথা দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে এতীমের প্রতিপালন করা। -দলীলুল ফালিহীন ২/৮০

যারা এতীমের ভরণ-পোষণ করবে তারা নবীজীর সঙ্গে জান্নাতে থাকবে দুই আঙ্গুলের মতো। 'দুই আঙ্গুলের মতো' এ কথার মর্ম কী? কুরতুবী রাহ. বলেন-

এর অর্থ হল, যারা এতীমের তত্ত্বাবধান করবে তারা জান্নাতে নবীজীর সঙ্গে থাকবে। -আলমুফহিম ৬/৬১৪

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الجَنّةَ كَهَاتَيْنِ.

যে ব্যক্তি দুটি কন্যাসন্তানের ভরণ-পোষণ করবে আমি এবং সে এভাবে জান্নাতে থাকব। (অর্থাৎ মধ্যমা ও শাহাদাত আঙ্গুল যেমন পাশাপাশি থাকে।) -জামে তিরমিযী, হাদীস ১৯১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৩১; আলআদাবুল মুফরাদ, বুখারী, হাদীস ৮৯৪

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যমা ও শাহাদাত অঙ্গুলীর দিকে ইশারা করে বলেন-

مَنْ عَالَ ابنتين أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى يَبِنّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنّ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنّةِ كهاتين.

যে ব্যক্তি দুই কন্যা বা দুই বোনের ভরণ-পোষণ করবে কিংবা তিন কন্যা বা তিন বোনের ভরণ-পোষণ করবে, যতক্ষণ না তাদের বিয়ে হবে কিংবা সে মৃত্যুবরণ করবে, আমি এবং সে জান্নাতে এভাবে (পাশাপাশি) থাকব। -সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৪৪৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২৪৯৮

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (অর্থাৎ তাদের পর্যায়ের নয়)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন-

المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ.

(দুনিয়াতে) যে যাদের ভালবাসে (আখেরাতে) সে তাদের সাথে থাকবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৪০

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে?

তিনি বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

লোকটি বলল, আমি এর জন্য তেমন কোনো প্রস্তুতি নিতে পারিনি; তবে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

(ইহকালে) তুমি যাকে মহব্বত করবে (পরকালে) তুমি তার সঙ্গে থাকবে।

আনাস রা. বলেন, নবীজীর এই কথা শুনে আমরা এত খুশি হয়েছি যে, দুনিয়ার অন্য কিছুতে এমন খুশি হইনি।

আনাস রা. আরো বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর ও উমর রা.-কে মহব্বত করি। তাই আশা করি, জান্নাতে আমি তাঁদের সাথেই থাকব, যদিও তাদের মতো আমল করতে পারিনি। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৩৯

সুন্নতে জান্নাত ক্রয়

বায়েজিদ বোস্তামি (রহ.)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তির কারামতের কথা বলা হলো যে অমুক এক রাতে মক্কা শরিফে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেন, এটি কোনো বড় অর্জন নয়।

কেননা শয়তানও মুহূর্তেই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারে। তাই কেউ যতই বাতাসে উড়ে দেখাক, আগে পরীক্ষা করে নেবে যে সে রাসুল (সা.)-এর সুন্নতের রাজপথে অবিচল কি না? (বাসায়েরুল আশায়ের পৃষ্ঠা ৬১২)

মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ.) জনৈক মুরিদকে বলেন, 'কারামতের ঠেলায় জমিন কেঁপে ওঠা বা মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যাওয়ার চেয়েও অজুর সময় মিসওয়াকের সুন্নত পালন করা হাজারো গুণ উত্তম।' (ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া: ২/১৯৫)

ইমাম আবু দাউদ (রহ.) একদা নৌ সফরকালীন একটি জাহাজে ছিলেন। তখন জাহাজ থেকে নদীর পার দিয়ে গমনকারী জনৈক পথিককে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে শুনলেন। তিনি জাহাজ থেকে নেমে এক দিরহামের বিনিময়ে একটি নৌকা ভাড়া করে পারে এসে হাঁচিদাতার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে এলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি তার জবাবে গিয়ে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলায় সে প্রতি-উত্তরে 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন) এ দোয়া করেছে, আর লোকটি হতে পারে এমন কেউ, যার দোয়া অবশ্যই কবুল করা হয়। তাহলে তো এটিই আমার সফলতার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর ওই রাতে জাহাজের যাত্রীগণ স্বপ্নে দেখল, জনৈক ব্যক্তি ঘোষণা করছে, 'নিশ্চয়ই আবু দাউদ এক দিরহামের বিনিময়ে জান্নাত ক্রয় করে নিয়েছে।' (ফাতহুল বারি : ১০/৬১০-৬১১)

আলেমগণ বলেন, আল্লাহর দরবারে আমল কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত: এক হলো— আকিদা বিশুদ্ধ হওয়া, দ্বিতীয়ত, সুন্নতের অনুসরণে হওয়া, তৃতীয়ত, নিয়ত সঠিক হওয়া।

সুন্নাহ পরিত্যাগে সমাজ ও বিশেষ করে যুবসমাজের অধঃপতন ও এর প্রতিকার-

বর্তমান আমাদের সমাজে লক্ষ করলে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের অপরাধ, নৈতিক

অবক্ষয় বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, অন্যের মাল সম্পদ হরণ, অধিকার হরণ এবং কি আইয়্যামে জাহিলাত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ কেও হার মানিয়ে দেয় এমন সব কর্মকান্ড আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে যা খুবই দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয় যেমন আমরা সেই সময়ের কথা উল্লেখ করতে চাই যেখানে আরবের অবস্থা ছিল এমন

আমরা সকলেই জানি যে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের মধ্যবর্তী ভূ-খন্ডের প্রসিদ্ধ নগর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানেই তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হয়েছিলেন। এই নগরের অধিবাসীরা একটি প্রাচীনতম সমাজের উত্তরাধিকারী। ঐতিহাসিকভাবে এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল চার হাজার

বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) এর বংশধরদের দ্বারা, যদিও প্রায় সেই একই সময়ে আরও কোন কোন বংশের লোকেরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্মের সময়কালীন আরব উপদ্বীপের একটা মুটামুটি চিত্র তুলে ধরার জন্য বলতে হচ্ছে এই সময়ের আরবরা নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়ে অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। ব্যভিচার, মদ্যপান ও জুয়াখেলা ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম। নির্মমতা ও স্ব-কল্পিত আত্মম্ভরিতা তাদেরকে সন্তান হত্যার বীভৎসতা পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। ছিনতাই অপহরণ ও কাফেলার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টি ও ধন-সম্পদ লুটে-পুটে নেয়াই ছিল তাদের অর্থনৈতিক তৎপরতা। নারী সমাজ ছিল সম্পূর্ণ অবহেলিত ও মানবিক অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তারা পশুকূল ও বস্তুসম্পদের ন্যায় উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হত। বহু প্রকারের খাদ্য কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, যা নারীদের খাওয়ার অধিকার ছিল না। পুরুষরা অসংখ্য নারীদের ভোগ করার স্বাধীনতা ভোগ করত, নারী পুরুষদের অবাধ মেলামেশা ও নাচ গান, ফুর্তিতে তারা মশগুল হয়ে থাকত। দারিদ্র ও খাদ্যাভাবের চিন্তায় তারা সন্তান হত্যা করত।জীবন্ত সন্তানকে সূতিকাগারে গলা টিপে বা অন্যভাবে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হত। আর যে সন্তানকে সূতিকাগারে হত্যা করা কোন কারণে সম্ভব হত না, পরবর্তীকালে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত। কুরআন, হাদীস এবং ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

যে সমাজে জনগণের জীবন গোত্রভূক্ত। আর গোত্রীয় হিংসা-বিদ্বেষ রক্তক্ষয়ী অবস্থার সৃষ্টি করত। গোত্রসমূহের মাঝে একবার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তা বংশানুক্রমিকভাবে ও শত শত বছর ধরে চলত, আর তাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিঃশেষ হয়ে যেত।

তখনকার আরব দেশে আধুনিক ধরণের কোন রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থা ছিল না। পারস্পারিক বিবাদ মীমাংসা বা মজলুমের ফরিয়াদ শোনার জন্য কোন বিচার ব্যবস্থা ছিল না। শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য পুলিশ বা বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিরোধের জন্য কোন সুসংগঠিত সেনাবাহিনী ছিল না, কোন প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ছিল না, কর ধার্য ও আদায় করার জন্য অপরাধীর বিচার ও শাস্তি দানেরও কোন ব্যবস্থা ছিল না। কোন ব্যক্তির কোন অধিকার বা মর্যাদা সুরক্ষিত ছিল না। কেউ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তা ফিরিয়ে দেয়ারও কেউ ছিল না। এক এক গোত্রের অন্তভূক্ত লোকদের কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না অপরাপর গোত্রের লোকদের সঙ্গে। মানুষ ছিল মরুভূমির উন্মুক্ত প্রান্তরের পশুকূলের মতো লাগামহীন। গোত্রের সর্বাধিক প্রবীন ব্যক্তি (যে অধিক ধন-সম্পদের মালিক ও সমধিক প্রভাবশালী)-কে গোত্রের সরদার বানানো হত। কোন গোত্রের লোকসংখ্যা বেশী হয়ে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে গেলে এক একটি শাখা-গোত্র স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গোত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত। এভাবে গোত্র

ব্যবস্থা সমগ্র আরবে বিস্তৃত ও সমপ্রসারিত হয়ে পড়েছিল। গোত্র ব্যবস্থায় কোন গোত্রের একজন লোক যদি অন্যায় করত অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তির সাথে তাহলে তার গোত্রের সব লোক তাকে পূর্ণ সমর্থন দিত। প্রয়োজন হলে তার জন্য যুদ্ধও শুরু করে দিত।

তখনকার দুনিয়া এবং বিশেষ করে আরব উপদ্বীপ ও মক্কার যে সাধারণ ও সর্বাত্মক বিপর্যস্ত অবস্থা ছিল, তাতে মানবতার জন্য আল্লাহর প্রেরিত একজন রাসূলের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত তীব্র। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নিছক কোন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাগুরু, দার্শনিক নিছক কোন ধর্ম প্রবর্তকের অথবা কোন স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতার পক্ষে কিছুই করার ছিলনা। শুধু আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, কোন খারাপ অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন বা সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণই ছিল তখনকার মূল চাহিদা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন বা আরব উপদ্বীপ ও তার অরাজনৈতিক জীবনে রাষ্ট্র ও রাজনীতি প্রবর্তন মৌলিক কাজ ছিল না। বলতে গেলে, এ ধরণের লোকের তেমন কোন অভাবও ছিল না, কিন্তু তাদের কারোর পক্ষেই আরব দেশের তখনকার প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এই সময় প্রয়োজন ছিল সর্বগ্রাসী জাহিলিয়াতের জগদ্দল পাথরের তলা থেকে বিশ্ব মানতাকে উদ্ধার করা, প্রয়োজন ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বিপ্লবের দায়িত্ব পালনের। প্রকৃত পক্ষে এর জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং কার্যত তা পালন করে তাঁর উপর অর্পিত মিশন তিনি পুরামাত্রায় সফল করে গেছেন।

আমাদের সমাজ এই পর্যায়ে যাওয়ার কারণ গুলোর মধ্যে হল-
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের নেতৃত্ব দান করেছেন তোমরা তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত আর এ কারণেই তোমরা বিশ্বমানবের নেতৃস্থানীয় হয়ে গেছে। ফল কথা, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্ব অনুসরণ করতে থাকলেই তোমরা সর্বোত্তম ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জনগোষ্ঠী হয়ে থাকবে। আর রাসূলের নেতৃত্ব অনুসরণ পরিহার করলে তোমরা বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী হওয়ার অধিকারও থাকবে না তোমাদের। তখন তোমরা এক বিভ্রান্ত ও আদর্শবিচ্যুত জনতার ভিড়ে পরিণত হবে। তোমরা হবে অন্যান্য জাতি কর্তৃক নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও পদদলিত।

বর্তমান মুসলিম জাতির বাস্তব অবস্থা আয়াতটির সত্যতা অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছে। সেই সাথে তা এই শিক্ষা দিচ্ছে যে, তোমরা যদি আবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বের অনুসারী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পার, রাসূল কার্যতই তোমাদের জীবনে অনুসৃত হন তাহলে তোমরা আবার সর্বোন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হতে পারবে।

আল্লাহ বলেন,وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ‘সেদিন রাসূল বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার উম্মত এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য গণ্য করেছিল’ *(ফুরক্বান ৩০)*।

বড় কষ্ট লাগে, বড় দুঃখ লাগে যখন দেখি, কুরআনকে বাদ দিয়ে মুসলিমরা আজ কুরআন বিরোধী আধুনিক নানা বিষয় নিয়ে মেতে আছে। হ’তে পারে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধার ফলে এমন হয়েছে, অথবা কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় তারা কুরআন বিরোধী বিষয় বেছে নিয়েছে। তারা আজ গান শোনে, গানের মজমায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে; কুরআনের মোকাবেলায় মানব রচিত বই-পুস্তককে প্রাধান্য দেয়; মানুষের বক্তৃতা-ভাষণ শোনে, মানুষের রচিত কবিতা আবৃত্তি করে, মানুষের সুর দেওয়া গান গায়, কিন্তু কুরআন পড়া ও শোনার কথা তারা মোটেও মনে করে না। কুরআনের সঙ্গে যারা এমন আচরণ করবে স্বাভাবিক ভাবেই কুরআনের সঙ্গে তাদের দূরত্ব তৈরি হবে, তাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বাড়বে, বিপদাপদও বড় হয়ে দেখা দিবে।

একইভাবে প্রিয় নবী ((সা.))-এর সুন্নাহ থেকে দূরত্বও আমাদের যুবসমাজের অধঃপতনের অন্যতম বড় কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ‘সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা হ’ল নিকৃষ্ট ঠিকানা’ *(নিসা ৪/১১৫)*।

আল্লাহ তা‘আলা সতর্ককারী ও ভৎর্সনাকারী রূপে বলেন,فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে’ *(নূর ২৪/৬৩)*।

রাসূলুল্লাহ ((সা.))ও তার সুন্নাহ অবজ্ঞাকারীদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى ‘যারা আমার সুন্নাহর প্রতি বিরাগ পোষণ করবে তারা আমার উম্মাহভুক্ত নয়’।[*বুখারী হা/৫০৬৩*] তিনি আরো বলেছেন, قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ ‘আমি তোমাদের আলোকোজ্জ্বল দ্বীনের উপর রেখে যাচ্ছি; যার রাত তার দিনের মতোই দৃশ্যমান। আমার পরে ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি ছাড়া কেউ এ দ্বীন থেকে বেঁকে বসবে না’।[ইবনু মাজাহ হা/৪৩] আরেক হাদীছে তিনি বলেছেন,قَدْ إِنِّى تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ‘নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনই পথ হারাবে না, আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ’।(হাকেম ১/১৭১ পৃ., হা/৩১৮)

সুতরাং আল্লাহর কিতাব পরিত্যাগ এবং আল্লাহর নবীর সুন্নাহ পরিত্যাগ ধ্বংস, পথভ্রষ্টতা ও অধঃপতনের বড় কারণ। আমরা মহান আল্লাহর নিকটে এহেন আচরণ থেকে পানাহ চাই।
এই মরণঘাতী ব্যাধি ও বিপজ্জনক অবস্থার প্রতিকার হিসাবে আমাদের যুবসমাজকে অবশ্যই কুরআনের কাছে ফিরে আসতে হবে। তারা কুরআনী বিধানকে নিজেদের জীবনে অবশ্য পালনীয় করে নিবে। তারা বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করবে, কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করবে, পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তারা কুরআনের ভিত্তিতে প্রতিপালিত হবে।
আফসোস! আমাদের সন্তানেরা পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়, কিন্তু তারা কম সংখ্যকই কুরআন পড়ে। কাজেই কুরআনের ভিত্তিতে তাদের প্রতিপালিত হওয়ার প্রশ্নই এখন আর ওঠে না। অথচ প্রতিপালন সূত্রে পিতা-মাতার উপর ফরয ছিল তাদের সন্তানদের কুরআন অধ্যয়ন করানো এবং সততার সাথে পরিচালনার মাধ্যমে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করানো। অভিভাবকদের উপর এ দায়িত্বও ফরয ছিল যে, তারা মাদরাসা (শিক্ষালয়) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাগ্রহণ করানোর মাধ্যমে তাদের কুরআনের জ্ঞান পাকাপোক্ত করাবে।
ভাইয়েরা আমার, এ জাতি যদি তাদের যুবসমাজকে এবং নিজেদেরকে অবক্ষয় ও অধঃপতন থেকে বাঁচাতে চায়, উদ্ধার করতে চায় তবে এ উম্মাহর ছোট বড় সকলকেই বংশপরম্পরায় এ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে।
শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন, ‘নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক সকল মুসলিমের উপর ফরয এই পদ্ধতি অনুসারে চলা এবং হকপন্থী আলেমদের থেকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ((সা.))-এর সুন্নাহ অনুধাবন করা। যেমন মালেক ইবনু আনাস (রহঃ) এবং পরবর্তীতে তার অনুসরণে আরও অনেকে বলেছেন, لَنْ يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا ‘এই উম্মতের প্রথম যুগের মানুষেরা যে পদ্ধতিতে সংশোধিত হয়েছে শেষ যুগের মানুষেরাও তা অবলম্বন না করা পর্যন্ত সংশোধিত হ’তে পারবে না’।[ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘ ফাতাওয়া ২০/৩৭৫।]
শায়খ বিন বায আরো বলেন, ‘উম্মতের প্রথম যুগের লোকেদের আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ((সা.))-এর সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, কুরআন ও সুন্নাহকে ধরে থাকার জন্য একে অপরকে উপদেশ দেওয়া, এ কাজে পরস্পরে সহযোগিতা করা এবং কুরআন ও সুন্নাহর পথে জীবন পরিচালনার মাধ্যমে সংশোধন ঘটেছিল। সুতরাং ভাইয়েরা আমার, আমাদেরও সকলের কর্তব্য হবে কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার জন্য একে অপরকে উপদেশ দেওয়া ও এ কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং আমাদের রবের কিতাব ও আমাদের নবীর সুন্নাহকে সবকিছুর উপর স্থান দেওয়া।
পূর্বসূরীগণ কুরআন-সুন্নাহর বাণীর যে অর্থ বর্ণনা ও অনুধাবন করেছেন তা থেকে সরে আসা ব্যতীত অন্য কোন কারণে ঘটেনি।

আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রের সুরক্ষার জন্য শান্তি শৃঙ্খলার জন্য বিভিন্ন বাহিনি (সেনাবাহিনি, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনি, পুলিশ, বিজিবি, আনসার) রয়েছে তবুও নানা ধরনের সমস্যা, অপরাধ ঘটেই যাচ্ছে, হত্যার মত অপরাধ যেন সেই যুগের মত নিত্ত নিমিত্ত ব্যাপার, শাস্তির ক্ষেত্রে তো সমাধান আর কার্যকরে লেগে যায় যুগের পর যুগ আর এর থেকে পরিত্রাণ পেতে আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ এর দিকে ধাবিত হতে হবে ও শরীয়তের বিধিবিধান সমাজে প্রতিষ্টিত করতে হবে।
হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লব ছিল রব্বানী বিপ্লব, আল্লাহ একমাত্র রব-মালিক, আইনদাতা, বিধান দাতা ও লালন-পালনকারী হওয়ার আকীদা ভিত্তিক বিপ্লব, মানুষকে মানুষের মালিকত্ব, আইন বিধানের কতৃত্ব ও লালন পালনকারীত্ব থেকে মুক্তিদানের বিপ্লব। তাই ইসলামী বিপ্লবের মৌলধারায় এই বিশ্বাস চির জাগরুক যে, সবকিছুর মালিক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, সার্বভৌমত্ব নিরংকুশভাবে একমাত্র তাঁরই আইন ও বিধান মানুষের উপর চলবে, একমাত্র তাঁরই বিধান চলবে যা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে নাযিল ও বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং দুনিয়ার যাবতীয় ধন-সম্পদে সকল মানুষের সমান অধিকার। প্রয়োজনীয় অংশ প্রাপ্তি থেকে কোন একটি মানুষও বঞ্চিত থাকবে না। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নেতৃত্বে সংঘটিত বিপ্লবে মানুষ নির্বিশেষে মর্যাদা ও অধিকার পেয়েছে, পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হয়েছে তাওহীদী আদর্শ।

এ বিপ্লবেরই প্রয়োজন দুনিয়ার মানুষের জন্য। সেই প্রয়োজন যেমন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল আজ থেকে সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে তেমনি আজকের দিনেও সেই প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে সর্ব প্রকারের আদর্শের, ইজমের ও বিপ্লবের চরম ব্যর্থতার পর এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আরও অধিক তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে বর্তমানে।

তাই আমরা চাই আজও বাস্তবায়িত হোক রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদর্শ, অনুসৃত হোক তাঁর পথ ও অভিমত, আর মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ভোগ করুক। আমীন।

সুন্নাহ ও বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয়-ভাবনা

ইরাকের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইসলামিক সায়েন্সেস কলেজ, বিশেষ করে ইরাক বিশ্ববিদ্যালয়, দিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয় ও ফালুজা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ অংশীদারিতে এবং নুন ফাউন্ডেশন ফর স্পেশালাইজড রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজের সহযোগিতায় ২০২৫ সালের ৯ ও ১০ জুলাই দোহুক প্রদেশে একটি আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের শিরোনাম ছিল 'সামাজিক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রচারে নবী (সা.)-এর সুন্নাহর ভূমিকা : সমসাময়িক পদ্ধতির আলোকে'। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল সমসাময়িক জীবনের বাস্তব প্রেক্ষাপটে নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহ কিভাবে প্রয়োগযোগ্য তা অনুসন্ধান করা এবং শরিয়তের আলোকে ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারে সুন্নাহভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ তুলে ধরা। এতে এমন কার্যকর কৌশল ও ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা সমাজে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, শান্তি ও সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সম্মেলনে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিময় জীবন গঠনে নবীজি (সা.)-এর নৈতিক মূল্যবোধকে কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন ইরাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক সায়েন্সেস কলেজের ডিন প্রফেসর ড. কাজিম খলিফা আল-হালবৌসি, সম্মেলনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সহকারী অধ্যাপক ড. নাশওয়ান মাহমুদ আস-সাফার।

সম্মেলনে নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহর বহুমাত্রিক দিক ও সমাজে এর প্রভাব নিয়ে **১১**টি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়।

প্রথম প্রবন্ধ 'সহনশীলতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মূল্যবোধ গঠনে সুন্নাহর ভূমিকা' নিয়ে। এতে তুলে ধরা হয়, কিভাবে নবীজি (সা.)-এর শিক্ষা ও আচরণের মাধ্যমে সহনশীলতা, ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে তুলে একটি নিরাপদ ও সহাবস্থানমূলক সমাজ গঠন সম্ভব। এ আলোচনায় সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ইতিবাচক সংলাপের পরিবেশ তৈরিতে নবীজি (সা.)-এর পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরা হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'ব্যক্তিগত মানসিক স্থিতিশীলতা অর্জনে নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহর প্রভাব'। এতে মনস্তাত্ত্বিক প্রশান্তি, আত্মতৃপ্তি ও মানসিক ভারসাম্য বৃদ্ধিতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনাগুলোর প্রভাব

বিশ্লেষণ করা হয়।

গবেষণায় নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহর আলোকে মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিষণ্নতা মোকাবেলার একটি আধুনিক, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও উপস্থাপন করা হয়, যা আজকের যুগে মানসিক সুস্থতার জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় প্রবন্ধ ‘সহিংসতা হ্রাস ও ইতিবাচক আচরণ প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহ’। এতে তুলে ধরা হয়, সমাজে সহিংসতা ও সংঘাত নিরসনে নবীজি (সা.)-এর নৈতিক শিক্ষা ও আচরণ কিভাবে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে, বিশেষ করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মতপার্থক্য ও দ্বন্দ্ব সমাধানের পদ্ধতিগুলো সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়।

চতুর্থ প্রবন্ধ ‘পারিবারিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রচারে সুন্নাহর ভূমিকা’। এতে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার রক্ষা এবং সন্তানের সঠিক লালন-পালনের ক্ষেত্রে নবীজি (সা.)-এর আদর্শ ও দিকনির্দেশনার তাৎপর্য তুলে ধরা হয়।

পঞ্চম প্রবন্ধ ‘সুন্নাহর আলোকে সংহতি ও পারস্পরিক সহায়তাভিত্তিক সামাজিক মূল্যবোধের প্রসার’ নিয়ে। এতে ব্যাখ্যা করা হয়, কিভাবে দান, দানশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও দলবদ্ধতার চর্চা সমাজে সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি করে এবং সামগ্রিকভাবে একটি নিরাপদ ও সহমর্মিতাপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।

ষষ্ঠ প্রবন্ধ ‘সুন্নাহ অনুসারে মানসিক চাপ মোকাবেলার আধুনিক পদ্ধতি’। এতে দৈনন্দিন জীবনের চ্যালেঞ্জ ও মানসিক চাপের প্রেক্ষাপটে নবীজির (সা.) প্রদত্ত দোয়া, জিকির, ধ্যান ও আত্মিক প্রশান্তির অনুশীলনের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। বিশেষভাবে দেখানো হয়, কিভাবে এই সুন্নাহভিত্তিক অনুশীলনগুলো আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

সপ্তম প্রবন্ধ ‘যুবসমস্যা ও আচরণগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নবীজির সুন্নাহর প্রয়োগ’। এতে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদিসের আলোকে তরুণদের মানসিক ও সামাজিক ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার পথ এবং তাদের ইতিবাচক, আত্মনিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বশীল আচরণের দিকে পরিচালিত করার কৌশল বিশ্লেষণ করা হয়।

অষ্টম প্রবন্ধ ‘নবীজির শিক্ষা ও সুন্নাহর আলোকে মনস্তাত্ত্বিক সুরক্ষার ধারণা’। এতে ব্যাখ্যা করা হয়, কিভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষা একটি সৎ, আত্মনিয়ন্ত্রিত ও মানসিকভাবে দৃঢ় প্রজন্ম গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে।

নবম প্রবন্ধ ‘নবীজি (সা.)-এর সুন্নাহ ও যুগের চ্যালেঞ্জ: প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক নিরাপত্তা’। এতে তুলে ধরা হয়, কিভাবে বর্তমান ডিজিটাল যুগে প্রযুক্তিজনিত বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ও সম্পর্কহীনতা মোকাবেলায় নবীজির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শিক্ষাগুলো প্রয়োগ করা যেতে পারে। পাশাপাশি ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক সম্পর্ক গঠনের জন্য সুন্নাহর ওপর ভিত্তি করে একটি সমন্বিত পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়।

দশম প্রবন্ধ ‘নবীজির সুন্নাহ ও সামাজিক সচেতনতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রসারে এর প্রভাব’। এতে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামষ্টিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, সামাজিক ন্যায়বিচার

প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকারের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করে—এমন একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সুন্নাহর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

একাদশ ও শেষ প্রবন্ধে আলোচনা হয় 'সামাজিক ও মানসিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় নবীজির সুন্নাহ, ইসলামিক স্টাডিজ এবং ভাষা ও সাহিত্য বিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রয়োগ' নিয়ে। এতে ব্যাখ্যা করা হয়, কিভাবে এই তিনটি জ্ঞানের শাখা একত্রে কাজ করে সমাজে চিন্তাগত স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়ে বলেন, সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, মানবিক মূল্যবোধের বিস্তার এবং আরব ও ইসলামী সমাজে সামাজিক সংহতি ও মানসিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নবীজির (সা.) সুন্নাহর শিক্ষা ও আদর্শকে কেন্দ্র করে কার্যকর শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক নীতিমালা প্রণয়ন এখন সময়ের দাবি। তাঁরা উল্লেখ করেন, সুন্নাহর মূল্যবোধকে আধুনিক বাস্তবতার আলোকে প্রয়োগ করে একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও সংহত সমাজ গঠন সম্ভব। (ওমর বিন নাসির
১৭ জুলাই, ২০২৫, কালের কণ্ঠ)

উপসংহার

একসময় মুসলিমরা ছিল সবার ওপরে। ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, যে
সময়ে আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে সময়ে আল্লাহ তাআলা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আর যখন আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুতে সম্মান খুঁজেছি, রাসূল (সা)--এর সুন্নাহর চেয়ে অন্য কিছুকে শ্রেষ্ঠ ভেবেছি, তখন পদে পদে লাঞ্ছিত হয়েছি।

মানুষের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও নমুনা। আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাবের মাঝে একটি শূন্যতা যেমন রেখেছেন তেমনি রেখেছেন পূর্ণতার একটি উপকরণ। শূন্যতাটি হচ্ছে, কোনো নমুনা ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। আর পূর্ণতার উপকরণটি হচ্ছে অনুকরণের যোগ্যতা। স্বভাবগতভাবেই মানুষ অনুকরণপ্রিয়। অনুকরণের তার প্রয়োজনও আছে। স্বভাবের এই চাহিদা ও প্রয়োজনটি তখনই যথার্থরূপে পূরণ হয় যখন মানুষ জীবন ও কর্মের একটি উত্তম নমুনা খুঁজে পায় এবং তার অনুকরণ ও অনুসরণের তাওফীক-প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য সেই নমুনা বানিয়েছেন শেষ নবী, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। তাঁর জীবন ও কর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ মানবজাতির জন্য আসমানী নমুনা, যার অনুসরণ-অনুকরণের মধ্যেই মানুষের দো'জাহানের মুক্তি ও সাফল্য।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যেমন আলকুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন তেমনি কুরআনের শিক্ষা ও বিধানের বাস্তব রূপ হিসেবে দান করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও উসওয়া। কুরআন মাজীদের শিক্ষা ও বিধানকে যখন সুন্নাহ ও উসওয়ার আলোকে জানা হবে ও মানা হবে তখন সেটাই হবে আল্লাহ তাআলার যথার্থ ফরমাবরদারী। এ ফরমাবরদারীর মাধ্যমেই মানুষের জীবন হয়ে উঠতে পারে সফল ও সুন্দর, নির্মল ও জ্যোতির্ময়।

জীবনের কোনো ক্ষেত্রই এই অন্বেষণ-অনুসরণের গণ্ডির বাইরে নয়। আমাদের চেতনা-বিশ্বাস, জীবন-দর্শন, জীবন বোধ, উৎসব-উপাসনা, পারস্পরিক সম্পর্ক, বিয়ে-শাদী, লেনদেন, নীতি-নৈতিকতা, আইন-বিচার, সবকিছুই এই অন্বেষণ-অনুসরণের গণ্ডির ভিতরে। এইসকল ক্ষেত্রে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ জানতে হবে এবং অনুসরণ করতে হবে। আমাদের ঈমানের কালেমা- ‘আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’-এর দাবির মাঝেই রয়েছে এই অন্বেষণ ও অনুসরণের অঙ্গিকার। সুন্নাহ ও উসওয়ার এই ইলম সেই ইলমেরই অন্তর্ভুক্ত, যার কথা বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত হাদীসে- ‘তলাবুল ইলমি ফারিযাতুন আলা কুল্লি মুসলিম’। ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

সুন্নাহ ও উসওয়ার অন্বেষণ ও অনুসরণের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব বুঝে এলে খুব সহজেই উপলব্ধি করতে পারব যে, এটি শুধু রবীউল আওয়াল মাসকেন্দ্রিক কোনো ব্যাপার নয়, নয় কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে দায়মুক্ত হওয়ার মতো বিষয়। এটি তো জীবনব্যাপী মগ্নতার বিষয়, যা খুব যত্নের সাথে অর্জন করতে হয় আর নিষ্ঠার সাথে পালন করে যেতে হয়।

এই পৃথিবীতে আদি পিতা আদম আ. ও মা হাওয়া রা.-এর মাধ্যমে সূচিত হয় মানবসভ্যতার যাত্রা। এক আলোকিত পরিবেশে। সে সুন্দর পরিবেশেই অগ্রসর হতে থাকে এই মনোরম পৃথিবী। সকলে আদমের সন্তান, আল্লাহর বান্দা। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ সুন্দর ও আলোকিত পৃথিবীকে গ্রাস করে অমানিশা। বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক। মানুষ হয়ে পড়ে প্রবৃত্তি ও শয়তানের দাস। ফলে মানবতাকে আচ্ছন্ন করে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের ঘন তিমির। দূর হয়ে যায় হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা। শুরু হয় পাপাচার, অনাচার, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা। বিঘ্নিত হয় ঈমান ও হেদায়েতের ঐশী আলোকধারার অগ্রযাত্রা। এ আলোকধারা রক্ষা করতে এবং সামনে অগ্রসর করতে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে প্রেরণ করেন অসংখ্য নবী-রাসূল।

এভাবেই চলছিল বিশ্ব পরিক্রমা। আলো ও অন্ধকার এবং ঐশী হেদায়েত ও জাহেলিয়াতের দ্বন্দ্ব ও পালাবদল। একপর্যায়ে পৃথিবীতে ধেয়ে আসে ভয়াবহ বিপর্যয়। দীর্ঘদিন যাবৎ স্থগিত থাকে আসমানী আলোকধারা। মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ঐশী শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে। ফলে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে খালেক ও মাখলুকের সম্পর্ক। ধীরে ধীরে বিদায় নেয় মানবতা ও ইনসানিয়াত এবং শেকড় পোক্ত করে নেয় নফস ও শয়তানিয়াত। শুরু হয় মানবতার হাহাকার আর অন্যায় অবিচার ও অমানবিকতার জয়জয়কার। পৃথিবীতে ছেয়ে যায় জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতি, স্বৈরাচার, পৈশাচিকতা, হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা। শান্তির পৃথিবীটা হয়ে পড়ে জ্বলন্ত নরককুণ্ড।

সে বর্বর পৃথিবীতে প্রাণের কোনো মূল্য ছিল না। অতি সামান্য বিষয়কে ক্ষেন্দ্র করে গোত্রে গোত্রে বেঁধে যেত তুমুল যুদ্ধ। সে যুদ্ধের বলি হত হাজার হাজার প্রাণ। যুগ যুগ ধরে চলতে থাকত প্রতিশোধের ধারা।

সে আগ্রাসী জনপদে মানুষের অর্থ ও ধনসম্পদের কোনো নিরাপত্তা ছিল না। চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি প্রতারণা-আত্মসাৎ ছিল সমাজের ভয়াবহ বাস্তবতা।

মুমূর্ষু মানবতা খুইয়ে বসেছিল সমস্ত মানবিক গুণাবলি। পরিণামে মৃত্যু ঘটেছিল ন্যায়, নীতি, সাম্য ও সমতার। সৃষ্টি হয়েছিল অমানবিক বৈষম্য। সে বৈষম্যে নিষ্পেষিত হচ্ছিল নারী, দাস-দাসী এবং সমাজের দুর্বল ও নিম্নশ্রেণির মানুষ।

পৃথিবী থেকে উঠে গিয়েছিল আইন ও বিচারের নীতিবোধ। মানুষ বেঁচে ছিল শুধু শক্তি আর দাপটের বলে।

আর দ্বীন-ধর্ম! স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির সম্পর্ক! তো সে জন্য যতই বিলাপ করা হবে কম হবে। ধর্ম ছিল সবচেয়ে অবহেলার শিকার। দ্বীন ও শরীয়ত ছিল স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারের সবচেয়ে উর্বর ভূমি। তাওহীদ ও একত্ববাদের প্রতীক কা'বায় স্থাপিত হয়েছিল তিন শ ষাটটি মূর্তি। আল্লাহর সঙ্গে এই সম্পর্কহীনতাই হচ্ছে জাহেলিয়াতের মূল ব্যাধি।

পৃথিবী থেকে মনুষ্যত্বের জানাযা বের হয়েছিল। মানুষের মন থেকে আল্লাহর ভয়-ভীতি বের হয়ে গিয়েছিল। পরকালের প্রাপ্তি ও শাস্তি সম্পর্কে চরম উদাসীন হয়ে পড়েছিল মানুষ। ফলে হৃদয়গুলো হয়ে উঠেছিল শক্ত, পাথরের চেয়েও কঠিন। আলকুরআনের ভাষায়–

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِىَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً.

এসব কিছুর পর তোমাদের অন্তর আবার শক্ত হয়ে গেল, এমনকি তা হয়ে গেল পাথরের মতো; বরং তার চেয়েও বেশি শক্ত। –সূরা বাকারা (০২) : ৭৪

মানুষ এমন অমানুষে পরিণত হয়েছিল যে, জ্যান্ত পুঁতে ফেলা নিষ্পাপ কন্যার 'আব্বু' 'আব্বু' আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠত, কিন্তু তা গর্তের উপরে থাকা জাহেলিয়াতের অহমিকায় অন্ধ নিষ্ঠুর পিতার মন গলাতে পারত না।

মোটকথা, খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে পৃথিবী পতন ও অধঃপতনের চরমে উপনীত হয়েছিল। মানবতা তার ধ্বংস ও বরবাদির সমস্ত আয়োজন পুরা করে ফেলেছিল। আত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক তথা সভ্যতার সব অঙ্গনে পচন ধরে গিয়েছিল। অন্যায় ও অবিচার, দুর্নীতি ও স্বৈরাচার এবং নৈরাজ্য ও পাপাচারের অগ্নিতে জগৎসংসার দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। খালিক, মালিক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে মানুষ নিজেকেই ভুলে বসেছিল এবং হারিয়ে ফেলেছিল স্বভাবগত বোধ ও বুদ্ধি এবং কল্যাণ-অকল্যাণের বিবেচনাশক্তি।

এমনই এক অন্ধকার সময়ে সর্বশেষ নবীরূপে প্রেরিত হন ঐশী জ্ঞান, গুণ ও শক্তিতে বলীয়ান এক মহামানব। সঙ্গে সত্য ও সভ্যতার সূর্য। সে সূর্যের দীপ্তিতে জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে মানুষের হৃদয়। বিদূরিত হয় কুসংস্কার ও জাহেলিয়াতের সমস্ত অন্ধকার। স্থাপিত হয় স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির বন্ধন। সভ্যতা সিঞ্চিত হয় স্রষ্টার প্রেমরসে এবং মনুষ্যত্বের কর্ম-গুণে। মানবতা পুনরায় পান করে সঞ্জীবনী সুধা এবং ফিয়ে পায় তার হারানো প্রাণ ও সজীবতা।

মানবতা কী?

নবীজির দৃষ্টিতে মানবতা হচ্ছে, মানুষের ইহকাল ও পরকালের স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ক্ষণস্থায়ী জীবনের মুক্তি ও শান্তির পাশাপাশি চিরস্থায়ী জীবনেরও শান্তি ও প্রশান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা।

এটাই হচ্ছে প্রকৃত মানবতা, যা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন জানমাল ও ইজ্জত-আবরুর নিরাপত্তা, বিবেকবুদ্ধি ও মেধা-প্রতিভার সুরক্ষা এবং মানুষের প্রাপ্য ও অধিকার সংরক্ষণ।

আর এই সবকিছুরও আগে প্রয়োজন বিশুদ্ধ তাওহীদের ধর্ম, ঐশী শিক্ষা ও নির্দেশনা, যা হচ্ছে সমস্ত কিছুর প্রাণ। তাই পৃথিবীবাসীকে আলোর পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে তাঁর ওপর নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আলকুরআন।

কুরআনই নির্ধারণ করে দিয়েছে তাঁর দাওয়াত ও সংস্কারের পথ ও পদ্ধতি। আলকুরআন জানাচ্ছে–

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমতের শিক্ষা দেবে, যদিও তারা এর আগে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত ছিল। –সূরা জুমুআ (৬২) : ২

আলকুরআনের এই নির্দেশনা সামনে রেখে তিনি কুরআনের পঠনপাঠন ও শিক্ষাদানে ব্রতী হন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করেন। মাখলুককে তার খালেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। মানুষকে পরকালের প্রাপ্তি ও শাস্তির বিশ্বাসে বলীয়ান করেন। মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টি করেন। ঐশী শিক্ষা ও দীক্ষার মাধ্যমে অন্তরাত্মা পবিত্র করেন। আসমানী নূরের আলোয় কলব ও হৃদয় আলোকিত করেন।

সে আলোর স্নিগ্ধতায় অন্ধ ও পাষাণ হৃদয়গুলো আলোকিত হয় এবং বিগলিত হয়। মনোজগতের সমস্ত কলুষতা বিদূরিত হয়। ফলে বস্তুবাদ, ভোগবাদ ও ইহবাদ ঝেড়ে দিয়ে মানুষ আল্লাহমুখী হয়ে ওঠে এবং পরকালের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয় আর মানবতার পাঠ শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখপানে। তিনি তখন একের পর এক শোনাতে থাকেন ইনসানিয়াতের মুক্তি ও উন্নতির বার্তা।

'নরহত্যা মহাপাপ' স্থির করে কুরআনের ভাষায় ঘোষণা দেন, অন্যায়ভাবে একজনকে হত্যা করা সমস্ত মানুষকে হত্যা করার সমান। আর একটি প্রাণ রক্ষা করা সমস্ত মানুষের প্রাণ রক্ষা করার সমতুল্য। [দ্র. সূরা মায়েদা (০৫) : ৩২]

এরপর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন, কেউ কারো ওপর আক্রমণ করলে সমান প্রতিশোধ নেওয়া হবে; প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে আঘাত। [দ্র. সূরা মায়েদা (০৫) : ৪৫]

এরইসাথে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও উদারতারও পাঠ দান করেন।

হৃদয়গুলো উন্মুখ ছিল। তাঁর নির্দেশনা সাদরে গ্রহণ করল। নিরাপদ হয়ে গেল মানুষের জান-প্রাণ। বন্ধ হয়ে গেল খুনাখুনি, অঙ্গহানি, গর্ভপাত ও শিশু হত্যা।

অর্থ ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে সুদ, ঘুষ, জুয়া ও প্রতারণা নিষিদ্ধ করেন। ওজন, পরিমাপ ও লেনদেনে কমবেশি করতে নিষেধ করেন। চুরি ও ডাকাতির জন্য কঠিন শাস্তি নির্ধারণ করেন।

মোটকথা অন্যের সম্পদ আত্মসাতের যত পদ্ধতি হতে পারে সমস্ত পন্থা হারাম সাব্যস্ত করেন। শুনিয়ে দেন আলকুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা–

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা পরস্পরে সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং বিচারকের কাছে সে সম্পর্কে এই উদ্দেশ্যে মামলা রুজু করো না যে, মানুষের সম্পদ থেকে কোনো অংশ জেনে-শুনে পাপের পথে গ্রাস করবে। –সূরা বাকারা (০২) : ১৮৮

বিশেষ করে এতীমের সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাপারে উচ্চারণ করেন কড়া হুঁশিয়ারি–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا.

নিশ্চয়ই যারা এতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা নিজেদের পেটে কেবল আগুন ভরতি করে। তারা অচিরেই এক জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে। –সূরা নিসা (০৪) :

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের হৃদয় কোমল ছিল, তাই নবীজীর নির্দেশনা হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হল। ফলে জানের সাথে মানুষের মালেরও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গেল।

ইজ্জত ও মান-সম্মান সংরক্ষণে তিনি মানুষকে পরস্পর মূল্যায়নের শিক্ষা দেন, কারো অসম্মান করার ওপর কঠিন সতর্কবাণী শুনিয়ে দেন। কুৎসা, পরনিন্দা, অপবাদ, গালমন্দ, উপহাস, দোষ চর্চা, মন্দ নামে ডাকা তথা কষ্টদায়ক সব ধরনের আচরণ হারাম সাব্যস্ত করেন। ব্যভিচার ও ব্যভিচারের প্ররোচক সব ধরনের কর্ম ও আচরণ নিষিদ্ধ করেন। এর সঙ্গে হায়া-লজ্জা, পবিত্রতা ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা অর্জনে অনুপ্রেরণা দেন।

পরিশেষে মানুষের জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করত যিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে তথা সম্মানিত মাসের সম্মানিত দিনে সম্মানিত স্থানে লক্ষাধিক সাহাবীর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা দেন–

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا.

তোমাদের রক্ত ও সম্পদ (নষ্ট করা) এবং তোমাদের মান ও ইজ্জত (খর্ব করা) তোমাদের ওপর হারাম, যেমন এই শহরে এবং এই মাসে আজকের দিন (-এর অসম্মান করা) হারাম। –সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৩৯

একটি সমাজের শান্তি ও উন্নতি সাধনে জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তার পাশাপাশি অতি প্রয়োজন আকল তথা বুঝ-বুদ্ধি ও উপলব্ধিজ্ঞানের সুরক্ষা এবং এর সুষ্ঠু বিকাশ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মহারত্নের প্রতিও মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। আকল-সম্পদের সুস্থতা ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য ও নেশাজাতীয় সবকিছু হারাম স্থির করেন, পরিমাণে তা যতই কম হোক। ঘোষণা দেন–

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

প্রত্যেক নেশাকারক বস্তু হারাম।

–সহীহ বুখারী, হাদীস ৪৩৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৩৩

আরও বলেন–

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُه فَقَلِيلُه حَرَامٌ.

যে জিনিস বেশি গ্রহণ করলে নেশা হয়, তার সামান্য পরিমাণও হারাম। –জামে তিরমিযী, হাদীস ১৮৬৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৮১

এখানেই কি শেষ! মস্তিষ্কের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে কুল কায়েনাত নিয়ে চিন্তাভাবনার তাকিদ দেন, আলকুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষা দ্বারা মেধাকে বিকশিত করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং নর-নারী সবার জন্য বিদ্যার্জনকে বাধ্যতামূলক সাব্যস্ত করেন।

আর হক ও অধিকার! সে ক্ষেত্রে তো মানবতার নবীর কোনো তুলনা হয় না। মায়ের সম্মান, স্ত্রীর অধিকার, মেয়ের মূল্যায়ন, বোনের মর্যাদাদান, নারীজাতির ইকরাম (স্নেহময় সম্মান) তাঁর আদর্শের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এতীম, দাস-দাসী ও অধীনস্তের সঙ্গে সদ্ভাব ও সুন্দর আচরণ তাঁর শরীয়তের অনন্য সৌন্দর্য। শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থের যত্ন-পরিচর্যা এবং নিঃস্ব, অনাথ ও অসহায়ের সাহায্য-সহযোগিতা নববী দর্শনের অলংকার।

এসম্পর্কে তাঁর কিছু নির্দেশনা লক্ষ করুন–

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

তোমরা নারীদের সঙ্গে সদাচারের উপদেশ গ্রহণ কর। –সহীহ বুখারী, হাদীস ৫১৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৪৬৮

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। –সূরা নিসা (০৪) : ১৯

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

আর স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে, যেমন রয়েছে তাদের প্রতি (স্বামীদের) অধিকার। –সূরা বাকারা (০২) : ২২৮

إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ.

দুই দুর্বল– এতীম ও নারী-এর অধিকার সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করছি। –মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১১; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৩৬৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৫৬৫

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া-মমতা দেখায় না এবং বড়দের অধিকার স্বীকার করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৪৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৭০৭৩

দাস-দাসীকে মনিবের ভাই-বোন হিসেবে মূল্যায়ন করেন, পানাহারে নিজেদের সঙ্গে সমতাবিধানের নির্দেশ দেন এবং তাদের ওপর ভারি কাজকর্ম চাপিয়ে দিতে বারণ করেন। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ৬০৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৬১)

মৃত্যুর সময় তাঁর জীবনের শেষ ওসিয়ত ছিল–

الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ، اتَّقُوا اللهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

নামায, নামায। দাস-দাসীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। –সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৫১৫৬; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৬৬০৫; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৫৮৫

এভাবে তিনি বিশ্ব-মানবতাকে পরিত্রাণ দেন। মানবতার সকল স্তম্ভকে পূর্ণতা দান করেন। তবে বলাই বাহুল্য, সমাজের সকল মানুষ তো তাঁর পয়গাম গ্রহণ করেনি। আবার যারা গ্রহণ করেছেন, তারাও তো মানুষ। মানবিক দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না তারাও। তাই মানবতার আদর্শ পথ চলায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা ছিল এবং কখনো কখনো সে আশঙ্কা বাস্তব রূপ নিত। কাজেই মানবতার মুক্তি ও সফলতার জন্য শুধু উপদেশদান আর ভীতি-প্রদশন যথেষ্ট নয়। শিষ্টের লালনের পাশাপাশি দুষ্টের দমনও প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ন্যায়নিষ্ঠ বিচারব্যবস্থা। সে ব্যবস্থায় চালু করেন আদর্শ আইন এবং কার্যকরি ও ফলপ্রসূ দণ্ডবিধি।

নির্ধারণ করেন হত্যা ও অঙ্গাহানির যথোপযুক্ত শাস্তি, চুরি, ডাকাতি ও ব্যভিচারের কার্যকরি সাজা এবং অপবাদ, মদপান ও জমিনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উপযুক্ত দণ্ড।

সারকথা, ইনসানিয়াতের নবী, মানবতার দরদি কান্ডারি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতার মুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন এবং সমাজ-সভ্যতাকে উন্নতি ও উৎকর্ষের সর্বশীর্ষে উপনীত করেছেন। অর্থ-বিত্ত, শক্তি-বংশ, গোত্র-দল, পদ-বর্ণ, সমাজ-ভূখণ্ড ইত্যাদির ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈষম্য ও জাহেলিয়াতকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করেছেন।

এর স্থলে তাকওয়াকে সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের প্রতীক নির্ধারণ করেছেন। মানবতাকে তিনি ঐশী ঘোষণা শুনিয়েছেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ.

প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। –সূরা হুজুরাত (৪৯) : ১৩

এরপর ঘোষণা করেছেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَ
لَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى.

হে লোকসকল! শোনো, তোমাদের সবার রব এক, তোমাদের সবার পিতা এক। শুনে রেখ, অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হবে কেবল তাকওয়ার মাধ্যমে। –মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৪৮৯

রাসুলুল্লাহ (সা) আনিত এই দ্বীন মানুষের চেতনা ও কর্মপ্রয়াসের সব অঙ্গনকে এমন এক ঐক্যবদ্ধ কাঠামোতে নিয়ে আসে যে, তাতে এই দ্বীনের প্রত্যেক

অনুসারীর মাঝে সৃষ্টি হয় অভিন্ন লক্ষ্য, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের অনুভূতি। ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার এক নিদর্শন এই দ্বীন,

সময় ও যুগের চড়াই-উৎরাইয়ে যা কখনো মলিন হয় না; বরং এ দ্বীনের আলোকিত শিক্ষার বদৌলতে মানুষের সমাজ ও সামাজিক সংকটগুলোর সর্বোত্তম সমাধান বের হয়ে আসে। এজন্যই এ দ্বীনকে বলা হয়ে থাকে দ্বীনে ফিতরাত বা স্বভাব-অনুকূল ধর্ম। এ দ্বীনের শিক্ষার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সহজতা ও স্বাভাবিকত্ব; জটিলতা ও সংকীর্ণতা এতে অনুপস্থিত।

জাহেলিয়্যাত ও জাহালত-মূর্খত্ব ও মূর্খতার মাঝে ইসলাম একটি পরিষ্কার বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে। ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জাহেলিয়্যাত হচ্ছে বিশেষ ওই আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির নাম, যা মিথ্যা অহংকার, গোত্রীয় আভিজাত্য ও প্রাধান্যের দ্বন্দ্ব, অন্ধ আবেগ ও চেতনা এবং

প্রতিশোধ ও চরমপন্থার এক সমন্বিত রূপ। জাহেলিয়্যাত হচ্ছে শক্তিপুজারী একটি আচরণব্যবস্থা। এতে ধৈর্য্য ও পরমত সহিষ্ণুতা গণ্য হয় দুর্বলতা হিসেবে। বুদ্ধি ও মেধার ক্ষেত্রে উন্মাদনা এবং সংলাপের জায়গায় প্রতিশোধের আওয়াজ উচ্চকিত করা জাহেলিয়্যাতের নীতি।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ বছরের মক্কী জীবন কাটিয়েছেন সাহাবায়ে কেরামের তরবিয়ত ও জীবন গঠনের পেছনে। এরপর যখন জিহাদের হুকুম এল তখনও এ নির্দেশনা প্রবল ছিল যে, সব শত্রুতা ও বৈরিতার মধ্যেও যেন ন্যায়ের নিশান হাতছাড়া না হয়। জিহাদ তো হচ্ছে হক্কের আওয়াজ উর্ধ্বে তুলে ধরা, প্রতিশোধের নাম জিহাদ নয়। তাওহীদের মর্ম একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া, অপর ধর্মানুসারীদের প্রভুদের গালাগাল দেওয়া নয়। মানবতার প্রতি সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছেন নবীজী। নবীজীর শিক্ষায় বর্ণ, বংশ, ভাষা ও সম্পদের ভিত্তিতে কারো মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। মর্যাদা ও সম্মান নির্ধারিত হয় কেবল তাকওয়া, নেক আমল ও ন্যায়ানুগতার ভিত্তিতে। এটাই তাকওয়ার পথ।

নবীজীর মোবারক সীরাত মানুষকে অন্ধকার থেকে সরিয়ে আলোর পথ দেখিয়েছে। নবীজীর মাধ্যমে দ্বীনের পূর্ণতা সাধিত হয়েছে এবং নবুওয়তের ধারা হয়েছে সমাপ্ত। আল্লাহ তাআলা আখেরী নবী ও আখেরী কিতাবের মাধ্যমে তার 'হুজ্জত' (প্রমাণ) চূড়ান্ত করেছেন। এখন হেদায়েতে ও গুমরাহির পথ স্পষ্টভাবে ভিন্ন, নেকি ও বদির মাঝে পার্থক্য পরিষ্কার। এখন আর নতুন কোনো নবীর প্রয়োজন নেই।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ ও শিক্ষার অর্থই হচ্ছে, কোনো আদর্শ সমাজের নমুনা। তাঁর শিক্ষা মানেই হচ্ছে পারস্পরিক একতা, ভ্রাতৃত্ব, সমতা, ন্যায় ও কল্যাণের মৌলিক মূল্যবোধের শিক্ষা। উজ্জ্বল ঐতিহ্যের মহৎ সম্পদকে কাজে লাগিয়ে তিনি সমাজের চেতনাকাঠামো নির্মাণ করেছেন। চরম হতাশাজনক ও ভেঙে পড়া একটি পরিবেশে আবির্ভূত হয়ে তিনি সমাজকে আবার গড়ে তুলেছেন। সামনে এগিয়েছেন তিনি একটি বিন্যস্ত পরিকল্পনা, চিন্তা ও কাজের একটি ছক, একটি নির্দিষ্ট পথনির্দেশনা এবং সর্বব্যাপী শুদ্ধির এক উজ্জ্বল ও সুগঠিত কর্মসূচি হাতে নিয়ে। পৃথিবীকে দিয়েছেন একটি নতুন সমাজব্যবস্থা, নতুন চিন্তা ও উপলব্ধি এবং উপমাতুল্য একটি চেতনাকাঠামো। আর এভাবেই তিনি সমাজকে সতর্ক ও শুদ্ধ করেছেন। আর এই ব্যবস্থার নামই হচ্ছে ইসলাম।(আল কাউসার, বর্ষ-৮,সংখ্যা-১)

মোটকথা আমাদের জিবনকে সুন্দর ও আখিরাত মুখি করতে হলে সুন্নাহর রঙে নিজেকে রাঙিয়ে সুন্নাহর সৌরভে জিবন গড়ার প্রয়াস ও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু তাই নয় আমাদের নবির সবচেয়ে বর সুন্নাহ ছিল কাফির মুশ্রিকদের ইসলামের পথে ডাকা

আর প্রত্যেক নবি রাসুল এই মিশন ও ভিশন নিয়ে দুনিয়া তে আগমন করেছেন। যা বিদায় হজ্জের ভাষণের দিন আমাদেরকে এই জিম্মাদারি দিয়ে গেছেন দাওয়াতের কাজ, কাফির, মুশ্রিকদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া কিন্তু আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে আজ মুসলমানরাই ইসলামের কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বহুত দূরে ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। জিবন্ত সুন্নাহ গুলোও যেন আমাদের অবহেলা আর গাফেলতি তে মৃত। তাই দুনিয়া তে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ঝান্ডা উড্ডয়ন ও সমুন্নত রাখার লক্ষে বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজ কে সুন্নাহ এর রঙ্গে নিজেকে রাঙিয়ে দাওয়াতের কাজ আরো বেগবান করতে হবে।

সর্বোপরি আমার মত এই অধম ও গুনাহগার বান্দা যার জানা ও মানার পরিধি কেবল আলিফ, বা, তা, এই জায়গাতে তখন বিশ্বনবি, আখেরিনবি, সাইয়্যেদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ বিষয়ে লিখা আমার মত অধমের পক্ষে অসম্ভব।

তবুও আইওম (Islamic Online Madrasa) এর মত প্রতিষ্টান যেখানে ইলমে ওহি ও মানুষকে সুন্নাহ সম্পর্কে জানা ও আমল এর উপর উঠানোর জন্য উস্তাদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ভালোবাসার নিগড়ানিতে এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। যেখানে ইলমের এই কিস্তিতে আমি খড়কুটোর মত কোনোভাবে ঝুলে রয়েছি মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও রহমতে।

"আলহামদুলিল্লাহ"

শেষ করছি আল-কাউসার এর একটি লিখা তুলে ধরার মাধ্যমে যেখানে ঘটনা এইরকম-

মুমিন-হৃদয়ের তামান্না- জীবনে-মরণে প্রিয় নবীর সান্নিধ্য। জীবনভর প্রিয় নবীর আদর্শে উজ্জীবিত হবে এবং মৃত্যুর পর জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করবে- ঈমানদারের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই। সাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাই। রবীআ ইবনে কা'ব আসলামী রা. ঐসব খোশনসীব সাহাবীদের একজন, যারা ছিলেন 'আসহাবে সুফফা'র অন্তভুর্ক্ত। দ্বীন শেখার জন্য সারা দুনিয়ার সবকিছু ছেড়ে পড়ে থাকতেন নবীজীর দুয়ারে। একবার তার জন্য উন্মোচিত হয়ে গেল সৌভাগ্যের আলোক-দিগন্ত। সেই বিবরণ দিয়েছেন রবীআ রা. নিজেই। তিনি বলেন-

আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রাত্রি যাপন করতাম। তাঁর জন্য অযুর পানি এনে দিতাম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য খেদমত আঞ্জাম দিতাম। এক

রাতে তাঁর ওযুর পানি এনে দিলাম। হঠাৎ আমার কানে প্রবেশ করল এক মধুর আওয়ায; নবীজী বললেন-

سَلْنِي.

তোমার কী চাওয়ার আছে, আমার কাছে চাও রবীআ!

তখন সবিনয়ে আমি আরয করলাম-

أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنّةِ.

আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আমার চাওয়া হল, জান্নাতে আপনার সান্নিধ্য।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

أَو غَيْرَ ذلِكَ.

এটা, না অন্য কিছু চাও?

আমি বললাম-

هُوَ ذاكَ

(আল্লাহর রাসূল!) এটা ছাড়া আমার আর কোনো চাওয়া নেই।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু সালাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السّجُودِ.

তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা করার মাধ্যমে এ বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করো। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ১৩২০

জান্নাতে নবীজীর সঙ্গলাভ! পরকালে প্রিয়নবীর সান্নিধ্য! এরচেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে! এর চেয়ে বড় খোশকিসমত আর কী থাকতে পারে? চাইতে হলে এভাবেই চাইতে হয়। এটাই মুমিন-হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনা। এটাই মুমিনের পরম ও চূড়ান্ত প্রত্যাশা। মুমিনের হৃদয়-রাজ্য দখল করে আছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম-ভালবাসা এবং জান্নাতে তাঁর সঙ্গলাভের পবিত্র তামান্না। হাদীস ও ইতিহাস-গ্রন্থে জ্বলজ্বল করছে এ ধরনের অনেক ঘটনা।

এরকমই আরেকটি ঘটনা রয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর। শুনুন, তাঁরই যবানে। তিনি বলেন-

এক রাতে আমি কয়েক রাকাত নফল নামায পড়লাম। নামাযের শেষে আল্লাহ তাআলার হামদ-ছানা আদায় করলাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করলাম। এরপর দুআ করতে শুরু করলাম। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমার অগোচরে) বলতে থাকেন-

سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَهْ.

তুমি (আল্লাহর কাছে) চাও, তোমাকে দেওয়া হবে। তুমি দুআ করো, তোমার দুআ কবুল করা হবে।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি দুআ করলাম। এরপর মসজিদ থেকে বাড়িতে চলে এলাম। ভোর হলে আবু বকর সিদ্দীক রা. আমার বাড়িতে আসেন এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি আজ রাতে কী দুআ করেছেন?

বললাম, আমি এই দুআ করেছি-

اللّٰهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَعَلَى جَنّةِ الْخُلْدِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান চাই, যার পর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না। এমন নিআমত চাই, যা কখনো ফুরাবে না। আর আমার (পরম) চাওয়া, চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গলাভ। -মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ১৬, ১৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭০৬৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৪৩৪০

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কী বলেন, যে কোনো সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি (অর্থাৎ তাদের পর্যায়ের নয়)। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন-

المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ.

(দুনিয়াতে) যে যাদের ভালবাসে (আখেরাতে) সে তাদের সাথে থাকবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৪০

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করল, কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে?

তিনি বললেন, কিয়ামতের জন্য তুমি কী প্রস্তুতি নিয়েছ?

লোকটি বলল, আমি এর জন্য তেমন কোনো প্রস্তুতি নিতে পারিনি; তবে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

(ইহকালে) তুমি যাকে মহব্বত করবে (পরকালে) তুমি তার সঙ্গে থাকবে।

আনাস রা. বলেন, নবীজীর এই কথা শুনে আমরা এত খুশি হয়েছি যে, দুনিয়ার অন্য কিছুতে এমন খুশি হইনি।

আনাস রা. আরো বলেন, আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবু বকর ও উমর রা.-কে মহব্বত করি। তাই আশা করি, জান্নাতে আমি তাঁদের সাথেই থাকব, যদিও তাদের মতো আমল করতে পারিনি। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৩৬৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৩৯

মহব্বতের দাবি কী?

যে যাকে মহব্বত করে সে তার সবকিছু ভালবাসে এবং সব বিষয়ে তার অনুসরণ-অনুকরণ করার চেষ্টা করে। প্রিয়জনের চিন্তা-চেতনার অনুসরণ করে। তার আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির অনুকরণ করে। সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করতেন প্রাণের চেয়েও বেশি। তাই তাঁরা নবীজীকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করতেন। তাঁর আনীত দ্বীন ও আদর্শের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুকরণ করতেন। এটাই মহব্বতের দাবি। এ ছাড়া মহব্বতের দাবি অনর্থক আত্মতৃপ্তি বৈ কিছু নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَ اللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

(হে নবী! মানুষকে) বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ৩১

আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, একদিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন-

يَا بُنَيِّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ. ثُمَّ قَالَ لِي: يَا بُنَيِّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الجَنَّةِ.

(قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب)

হে বৎস! তুমি যদি এমন অবস্থায় সকাল ও সন্ধ্যা যাপন করতে পার যে, দিলে কারো প্রতি হিংসা নেই, তাহলে এমনই কর। এটা আমার সুন্নত।

আর যে আমার সুন্নত যিন্দা করল সে আমাকে মহব্বত করল। আর যে আমাকে মহব্বত করল সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৭৮; তাযীমু কাদরিস সালাহ, হাদীস ৭১৪; মুজামে আওসাত, তবারানী, হাদীস ৫৯৯১

একটি দুআ

নিবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, এক রাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ আজ যে দুআ করবে সে দুআই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন। পরদিন তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ঐ রাতে তিনি ঈমান, জান্নাত ও জান্নাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকার দুআ করেছিলেন। এটা শুধু তাঁর ঐ রাতের দুআ নয়; বরং সবসময় তিনি এই দুআ করতেন। তাঁর পুত্র আবু উবায়দা রাহ. বলেন, আব্বাজী একদিন বলেছেন-

إن لي دعاء ما أكاد أن أدعه.

আমার একটা দুআ আছে, যা কখনো বাদ দিই না।

এরপর তিনি এই দুআটি উল্লেখ করেছেন-

اللّٰهُمّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي أَعَلَى جَنّةِ الْخُلْدِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এমন ঈমান চাই, যার পর কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন হবে না। এমন নিআমত চাই, যা কখনো ফুরাবে না এবং আমার শেষ চাওয়া সুউচ্চ জান্নাতে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গলাভ। -মুসনাদে আবু দাউদ তয়ালিসী, হাদীস ৩৩৮; মারিফাতুস সাহাবা, আবু নুআইম ৩/২৩২-২৩৩, হাদীস ৪৫০১; হিলইয়াতুল আউলিয়া ১/১২৭

আসুন, জান্নাতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু সালাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের আশায় উল্লিখিত আমলগুলো করতে থাকি। পাশাপাশি এই দুআটিও জারি রাখি। (আল কাউসার-বর্ষ:১৭, সংখ্যা:১১)

বর্ষ: মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আমল ও দুয়া করার তৌফিক দান করুক এবং আমাদের মুসলিম-মুসলিমাহ, মুমিন-মুমিনাহ, বিশেষ করে আমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, আইওম এর উস্তাদ-উস্তাযা, ত্বলিব- ত্বলিবাদের জান্নাতে আমাদের প্রিয় নবির সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ ও সেই সাহাবা ওয়ালা ভালোবাসা আমাদের অন্তরে দান করুন।

আল্লাহুম্মা আমিন।